ক্ষত্রিয়-কুল-তিলক

পিতৃতুল্য

মহামান্য

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু দামোদর দাস বর্ম্মণের

শ্রীচরণ কমলে

এই গ্রন্থ

ভক্তিউপহার স্বরূপ

উৎসর্গ করিলাম।

চন্দ্রলেখা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি কোথায়?

"ন নিহন্তি ধৈর্য্য মনুভাবগুণঃ॥"

ভারবি।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব-কালে অনেক রাজপুত বীরপুরুষ মোগল-অনীকিনী সমুজ্জ্বল করেন। রাজা মানসিংহ বঙ্গের শাসন-কর্তৃপদে অভিষিক্ত হইয়া যখন বঙ্গে আগমন করেন তখন তৎসঙ্গে তদনুচর অনেক রাজপুত-তনয় কেহ বা সৈনাপত্য কেহ বা সৈনিক হইয়া এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন। বঙ্গের সুশ্যামল সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র যেন প্রকৃতি দেবীর মাধুরী-পূর্ণ সুচারুমূর্ত্তি। বঙ্গে বসুন্ধরা বিবিধ শস্যের খনী। তাঁহারা অনেকেই সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্যই হউক অথবা কার্য্যানুরোধেই হউক পুত্রকলত্রসহ বঙ্গে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে আরও অনেক রাজপুত-তনয় এদেশে আসিয়া অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

একদা মানসিংহের শাসনকালে একদল মোগলসৈন্য

মেদিনীপুর হইতে বৰ্দ্ধমান আসিতেছিল। বৈশাখ মাস। বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। প্রভাকরের প্রখর কিরণে ধরণী উত্তপ্তা ও আকুলিতা হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল— ঝড় উঠিল। প্রিয়তমা সখীর ন্যায় ধূলি ঝটিকার সহচরী হইল। অবলা প্রবলা দেখিয়া দিনমণি লজ্জাবশতঃ মেঘান্ত-রালে লুক্কায়িত হইলেন। দশদিশ্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। প্রভঞ্জনের প্রবল প্রতাপে মহীরুহ থরথর। তৃণ, পত্র প্রভৃতি ধূলির সহিত গলাগলি করিয়া গগনমার্গে খেলিতে খেলিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। অসংখ্য পাদপের পদ স্খলিত হইল। সম্মুখ-সমরে বীরকেশরী যেরূপ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ভীষণ কড়কড় ধ্বনিতে ধরাশায়ী হন, পাদপগণ সেইরূপ শ্রুতিকঠোর মড়মড় শব্দে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

সৈন্যগণ শিবির সন্নিবেশ করিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিতে ছিল। যে সকল তরুচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া তাহাদের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল তাহারা বিলোড়িত হইতে হইতে কেহ বা ধরণী শয়নে দেহ ঢালিয়া দিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিল, কেহ বা ভগ্নশাখ হইয়া বিকৃতমূর্ত্তি ধারণ করিল। শিবির সকল ছিন্ন বিছিন্ন হইল; সেনাকুল ভয়াকুল হইয়া যে যথা পাইল আশ্রয় গ্রহণ করিল। গজ বাজী ত্রস্ত ও বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল।

এইরূপ বাত্যিকার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে বিজয় সিংহ নামে একজন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ সেনাপতির আদেশ ক্রমে তাঁহার কোনও আবশ্যক দ্রব্যের অনুসন্ধানে দেড় ক্রোশ দূরে প্রান্তর প্রান্তে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

অৰ্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে প্রভঞ্জন তাঁহার অনুসরণ করিল। শিবিরে প্রত্যাগমন মানসে তিনি অশ্বকে তদভিমুখে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন; পবনদেব তাহাতে বাদ সাধায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। ধূলি-ব্যাকুলিত প্রভঞ্জন-তাড়িত অশ্বারোহী পুরুষ কোথায় গেলেন আর দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রমে ঝড় থামিল, বেলা পড়িল, সন্ধ্যা হইল কিন্তু বিজয় সিংহ প্রত্যাগত হইলেন না।

ক্রমশঃ নৈশ অন্ধকার ভূতল, দিঙ্মণ্ডল এবং মেঘাচ্ছন্ন নিবন্ধন নভস্তলকেও আপনার সমান বর্ণ করিয়া লইল। বিজয় সিংহ বীর-সিংহ; তিনি যে স্বামি-কার্য্যে প্রেরিত হইয়া অন্ধকারানুরোধে কোথাও অবস্থিতি করিবেন ইহা কি কখনও সম্ভব হয়? তবে কি সেই প্রবল বায়ু মধ্যে তাঁহার প্রাণবায়ু মিশাইয়া গিয়াছে? তিনি কি তবে কোনও অভিনব দুস্তর বিপদে পতিত হইয়া আত্মহারা হইয়াছেন? একান্ত-তামসী নিশায় একাকী কোনও ভয়াবহ স্থানে পতিত হইয়া "কোথায় আসিলাম" ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে? ক্ষুধা, পিপাসা, পরিশ্রম এবং ভীষণ ঝটিকার প্রবল তাড়নে সেই বীর-কেশরী কোথাও কি অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়া আছেন?

—০:০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চারুগ্রামে।

"উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং,
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।"

শকুন্তলা।

প্রবল ঝটিকায় বিতাড়িত দিগ্‌ভ্রান্ত এবং বিপথগামী হইয়া বিজয় সিংহ এক নিবিড় অরণ্যে আসিয়া পড়িলেন। প্রভঞ্জন অসংখ্য শাখা প্রশাখা তাঁহার উপর নিপাতিত করিয়া যেন তাঁহার বল পরীক্ষা করিল। তিনি অটল অচলবং সে সকল সহ্য করিলেন। ক্রমে যখন প্রভঞ্জন নিবৃত্ত এবং নৈশ-তমঃ প্রবৃত্ত হইল তখন তিনি বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। দিগ্‌ভ্রম-নিবন্ধন যতই তিনি বহির্গমনের প্রয়াসে যত্ন করিতে লাগিলেন ততই দুস্তর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

এরূপ তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে নিবিড় অরণ্যে একাকী অবস্থান করিতে কাহার হৃদয়ে না ভয়ের সঞ্চার হয়? কিন্তু বীরবর বিজয়ের হৃদয়ে ভয়ের লেশমাত্র নাই। একে অন্ধকার তাহাতে নিবিড় অরণ্য তাহাতে আবার দিগ্‌ভ্রম; এরূপ স্থলে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা মূঢ়তা বিবেচনায় তিনি অরণ্য মধ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষতলে অশ্বকে সতর্কতার সহিত বন্ধন করিলেন এবং স্বয়ং বৃক্ষের এক পার্শ্বে তরুমূলে মস্তক দিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন।

পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত জীবের উপর নিদ্রাদেবীর বিশেষ অনুকম্পা, সুতরাং মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিনি নিদ্রিত হইলেন। যামিনী শেষে স্বপ্ন দেখিলেন—যেন, "এক মৃদুলবাহিনী কল্লোলিনীর কূলে সমৃদ্ধিশালী ফল-শস্যপূর্ণ একটী রমনীয় পল্লী। তিনি যেন সপরিবারে সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। অকস্মাৎ স্বপ্ন পরিবর্ত্তিত হইল, তখন দেখিলেন যেন এক রোরুদ্যমানা ললিত-ললনা নিজ সুধাংশুপ্রতিম শিশু সন্তানকে ধর্ম্মের চরণে অর্পণ করিয়া আপনার পবিত্র বরাঙ্গ প্রজ্বলিত চিতায় উৎসর্গ করিলেন। রমণীর রমনীয় অঙ্গ অগ্নিতে পড়িয়া হুহু করিয়া দগ্ধ হইয়া গেল। চারু চন্দ্রমার প্রফুল্লতায় গঠিত সেই পতিব্রতা রমণীর পরিত্যক্ত শিশু সন্তানটীকে যেন কে একজন ধর্ম্মব্রত পুরুষ তদীয় কোনও বংশধরের নিকট রাখিয়া গেলেন। দেখিলেন শরদিন্দুর ন্যায় যখন সেই বালক পরিবর্দ্ধিত হইল তখন তদ্বংশোদ্ভবা লাবণ্যময়ী চারুকেশী এক কুমারী যেন যুবকের কণ্ঠে মনোহর কুসুমহার অর্পণ করিবার জন্য উদ্যত হইল; যুবক অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। কুসুম-কলিকার ন্যায় বালিকা মনস্তাপে মলিনা হইল। চন্দ্রিকা চন্দ্রমার অনুসরণ করিল। সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকার তাঁহার গৃহকে আচ্ছন্ন করিল। শোকের ঝড়ে হৃদয়তরু ভগ্ন হইল। দেখিলেন যেন কিয়ৎক্ষণ পরেই ঝড় থামিয়াছে; সুখদ মলয়ানিল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে; ভগ্ন-তরু মঞ্জরিত হইয়া নয়ন মন মুগ্ধ করিতেছে; শীর্ণদেহ প্রফুল্ল ও পুলকিত হইয়াছে; স্বর্ণলতিকা সহকারে জড়িতা হইয়াছে। কামিনীকুসুম হাসিল; সরল হাস্যের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় জগৎ ভাসিল; সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ

হইল। দেখিলেন প্রাতরালোকে দিক্‌সকল সমুজ্জ্বল হইয়াছে; বিহঙ্গমের কলধ্বনি দিবাগম ঘোষণা করিতেছে।

ধরণী-শয়ন পরিত্যাগ করিয়া অশ্বকে উন্মোচন করিলেন এবং অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অপরিচিত পথে আসিতে আসিতে তিনি দ্বারকেশ্বর নামে এক নদীর উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কল্লোলিনী কুল কুল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তীরে চারুতার নিদান চারুগ্রাম। প্রবাহিনী পার হইয়া গ্রামে আসিলেন। গ্রামের কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের সাদর সম্ভাষণে সেদিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। লোকের ঐশ্বর্য্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহার নয়ন মন মুগ্ধ করিল। নিজ স্বামীর অনুমতি এবং গ্রামস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুগ্রহ পাইয়া তিনি পুত্র কলত্র সহ তথায় আসিয়া বাস করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের মধ্যে গণ্য মান্য এবং ধনাঢ্য হইয়া উঠিলেন।

তিনি বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আদর ভাজন হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। এইরূপে তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েক পুরুষ অতীত হইল।

জগচ্চন্দ্র সিংহ নামে এক মহা পুরুষ তাঁহার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। জগচ্চন্দ্র জ্ঞানী দানী এবং ধনী ছিলেন। তাঁহার অতিথি সৎকারও বিলক্ষণ ছিল। একদা এক শুভ্র শ্মশ্রু শান্তমূর্ত্তি নাতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জগচ্চন্দ্রের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধব্রাহ্মণকে দেখিলে দেবর্ষি বলিয়া জ্ঞান হয়। তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন শিষ্য এবং পরিণত শারদ সুধাকর সন্নিভ সুকুমার এক কুমার। বালকের প্রফুল্ল বদন-

কমল যেন লাবণ্যের উৎস, নয়ন যুগল আয়ত; বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, বাহুদ্বয় সুঠাম এবং আজানুলম্বিত। বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর।

জগচ্চন্দ্র সেই দেবর্ষিতুল্য পুরুষবরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ভাবে পূজা করিলেন। সুকুমার কুমারের মোহন রূপে মুগ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণ জগচ্চন্দ্রকে কহিলেন,—

"আমি পুরুষোত্তম যাইব; তুমি এই বালককে স্বীয় পুত্রের ন্যায় যত্নে লালন পালন এবং নিজ অপত্যের সহিত সমভাবে সুশিক্ষিত করিও। এই বালকটী কোনও মহামান্য সৎকুলোদ্ভব যশস্বী বীর কেশরীর কুমার; ইহার নাম কুমার সিংহ। মাতা পিতৃ হীন এবং নিরাশ্রয় দেখিয়া ইহাকে এতাবৎ কাল আমি লালন পালন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে তোমাকে আমি এই বালক প্রদান করিলাম; অতঃপর তুমি ইহার পিতা স্বরূপ হইলে। ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে তুমি সুখী হইবে। আমার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ লাভ নাও হইতে পারে।"

এই বলিয়া এবং সেই বালককে জগচ্চন্দ্রের গৃহে রাখিয়া তিনি শিষ্যসহ ঈপ্সিত স্থানে যাত্রা করিলেন।

জগচ্চন্দ্রের সন্তান সন্ততির মধ্যে একটী মাত্র কন্যা ছিল। কন্যাকে একবৎসরের রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন। তিনি আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। জগচ্চন্দ্রের বৃদ্ধা মাতা স্নেহ-পুত্তলিকা ঐ কন্যা এবং সন্ন্যাসি-দত্ত সেই সুকুমার কুমারকে সমভাবে ভালবাসিতেন। বরং কন্যা অপেক্ষা কুমারকে সমধিক স্নেহ করিতেন। সন্ন্যাসী জগচ্চন্দ্রের কন্যার নাম রাখিয়া যান চন্দ্রলেখা। কুমার চন্দ্রলেখাকে

বড় ভাল বাসিত। শয়নে, ভোজনে, খেলায়, যেখানেই দেখিবে, দেখিবে চন্দ্রলেখা এবং কুমার! বিমল কৌমুদী যেন শরত সুধাকরের প্রাণে প্রাণে জড়িত! এই রূপ পরস্পরের ভালবাসায় এবং বৃদ্ধার যত্নে ও আদরে তাহারা দিন দিন শশি-কলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্যখেলা।

"কুসুম-রতনে তুলি সযতনে
গাঁথি সুচিকণ হার;
হৃদয় রতনে সাজাতে যতনে
না হয় মানস কার?"

চারুগ্রাম। বেলা অবসান হইয়াছে। দিবাকর গোধূলী রাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তাচলের দিকে গমন করিলেন। কমলিনী অভিমান ভরে বদন ঢাকিল। নীলাকাশে আরোহণ করিয়া সুখসাগরে ভাসিতে ভাসিতে চন্দ্রমা উদিত হইলেন। সরোবরে মলয় পবন মৃদুমন্দ তরঙ্গ তুলিয়া কুমুদিনীকে সংবাদ দিল। সুধাকর স্নিগ্ধকর করপ্রসারণে প্রিয়তমা কুমুদিনীর রুচির মুখখানি ধরিয়া কতই সোহাগ করিলেন, কিন্তু কলানিধি বিধিবশে যে কুমুদিনীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন যেন তাহারই

স্মরণ করিয়া কুমুদিনী ক্রোধ বশতঃ কথা কহিল না। মলয়ানিল চুপে চুপে মানিনীর কাণে কাণে বলিল "হৃদয় চাঁদ না হয় দৈববশে তোমায় ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তা বলিয়া তোমার ন্যায় পতিপ্রাণা কামিনী কি কখন প্রাণেশের প্রণয়াদরের অনাদর করে? দেখ দেখ! শশী হাসী হাসী মুখ খানিতে কেমন তোমার আদর করিতেছেন!" কুমুদিনী হাসিল; মধুর হাসী মধুকর দেখিতে পাইল।

এরূপ সন্ধ্যায় উদ্যানে বসিয়া একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক দ্বারকেশ্বর নদীর কল্লোলশব্দ শ্রবণ করিতেছে এবং কল্লোলিনীর কোলে তরঙ্গের খেলা দর্শন করিতেছে; চিত্ত তাহাতেই একান্ত আকৃষ্ট। অনতিদূরে একটী বালিকা আপন মনে একটী মালা গাঁথিতেছে; বালিকা এই অষ্টম বৎসরে পা দিয়াছে। বালিকার মালা গাঁথা শেষ হইল। মালা লইয়া কি করিবে, একবার স্থিরচিত্তে তাহাই ভাবিল; ক্ষুদ্র মনে ভাবনা স্থান পাইল না। অবশেষে মালাটী বালকের গলদেশে অর্পণ করিল। বালক স্থিরচিত্তে বালিকার দিকে চাহিয়া দেখিল; কি দেখিল?—দেখিল চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা মালাটী পরাইয়া দিয়া বলিল "আহা কেমন সেজেছে!"

এই বলিয়া অন্যমনে বালিকা চাঁদের দিকে চাহিল। দেখিল চাঁদটী যেন ঠিক কুমারের মুখের মত সুন্দর!

যতক্ষণ চন্দ্রলেখা চাঁদ দেখিতেছিল ততক্ষণ কুমার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতেছিল। চন্দ্রলেখা কুমারকে এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া মধুর স্বরে কহিল "কুমার! আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

কুমার কিছু চকিত হইয়া উত্তর করিল "কি দেখিতেছি ?—কেন, তোমারঐ সুন্দর মুখ খানি !"

বালিকা বলিল "তোমার মুখও ত বেশ সুন্দর !"

কুমার উত্তর করিল "তবু তোমার মত নয় !"

বালিকা ব্যস্ত ভাবে কহিল "কি বাজী, আমার চেয়েও যদি সুন্দর হয় ! তুমি বরং একবার দেখ দেখি !"

কুমার তাহার সরলতাময় মধুর বাক্যে মনে মনে হাসিয়া নীরবে রহিল। বালিকা আবার অন্যমনে চাঁদের দিকে চাহিল। চাহিবা মাত্র মনে হইল "আচ্ছা ঐ চাঁদটী কা'র ?" জিজ্ঞাসা করিল "কুমার ! ঐ চাঁদটী কার ?"

কুমার বলিল "কেন, ও চাঁদটী আমার।"

বালিকা বলিল "তোমার কেন হবে, আমার চাঁদ, আমি যে আগে দেখেছি।"

এইরূপে বিবাদ বাধিল। চাঁদ তাহাদের বিবাদ দেখিয়া মুচকি হাসি হাসিয়া চলিয়া চলিয়া নীলাকাশে ভাসিতে লাগিল। ক্রোধে বালিকা প্রতিশোধ লইবার জন্য কুমারের গলা হইতে মালা খুলিয়া আপন গলায় পরিল। তাহার পর অভিমানে সরিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। কাল-নীরদে ক্ষণ-কালের জন্য চন্দ্র আবরিত হইলে পৃথিবীতে মেঘের ছায়া পড়িল ; কুসুম কানন আঁধার হইল, বালিকা হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে করিল বিবাদ করিয়া ভাল করি নাই। একাকিনী এক পার্শ্বে দাঁড়াইতে আর সাহস হইল না অবশেষে এক পা এক পা করিয়া সরিয়া সরিয়া বাল-কের কোলে গিয়া লুকাইল। ভাবিয়াছিল তাহার সহিত

জন্মেও আর কখন কথা কহিবে না। বালিকা কোলের ভিতর লুকাইল ; বিবাদও মিটিয়া গেল।

এইরূপে বাল্যক্রীড়ার সহিত তাহাদের অপূর্ব্ব ভালবাসা জন্মিল। কিন্তু সে ভালবাসা যে কিরূপ ভাবের প্রথমতঃ তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। ভাই ভগ্নিতে পরস্পর যে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে ইহা কি সেইরূপ ? হইতে পারে এই কেবল মাত্র প্রণয়াঙ্কুর বহির্গত হইতেছে। এরূপ অঙ্কুরের যাথার্থ নির্ণয় সুকঠিন। এ সকল জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। যখন বালিকা জানিল যে কুমারের মুখমণ্ডলে কি যেন কেমন একরূপ সুন্দর জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে, তাহার দিকে চাহিলেই সেই জ্যোতিঃ চন্দ্রলেখার চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে অথচ তখন ইহা কি, বালিকা বুঝিতে পারিত না। কেহ যদি তাহাদের সে ভাব দেখিতে পাইতেন তিনিই বুঝিতেন ইহা কিরূপ প্রকৃতির ভালবাসা। আর যখন পাঠ দিবার সময়ে পুস্তকের দিকে না চাহিয়া ভ্রমবশতঃ বালিকা কুমারের মুখের দিকে চাহিত, খেলিবার সময় তাহার মুখমণ্ডল দেখিত, দেখিয়া দেখিয়া আবার দেখিত অথবা কুমার গুরুজনের নিকট বসিয়া থাকিলে চন্দ্রলেখা কোন একটী ভাণ করিয়া একবার দেখিয়া আসিত ; অন্তরালে লুকাইয়া দেখিত এবং সেই সময়ে অকস্মাৎ কুমারের চক্ষে চক্ষু পতিত হইলে যখন মুচকি হাসি হাসিয়া পলাইত, তখন যদি কেহ তাহাদের সেই ভাব দেখিতে পাইতেন তিনিই বুঝিতেন ইহা কিরূপ প্রকৃতির ভালবাসা। অন্য সময়ে দেখিলে কে বলিবে, উহাদিগের মধ্যে কোন

অভিনব ভাব লুক্কায়িত আছে। বলা বাহুল্য যে পরস্পর পরস্পরকে শীঘ্রই প্রেমচক্ষে দেখিতে শিখিল। সে যাহা হউক কে বলিতে পারে যে এই সুবিমল পবিত্র প্রণয়েও বিচ্ছেদের ছায়া লুক্কাইত আছে সে ছায়া যে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইবে; আর কখন সে অন্ধকার বিলীন হইয়া তাহাতে বিমল জ্যোৎস্না বিকাশ হইবে কিনা তাহাই বা কে বলিতে পারে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাল্যগতে।

"সুজনক প্রেম হেম সমতুল
দহিতে কনক দ্বিগুণিত মূল।
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত ॥"

বিদ্যাপতি।

কালচক্রে সকলই বিঘূর্ণিত। কালে কত স্থলভাগ জলরূপে কত নদ নদী স্থলচর জীবের আবাসরূপে পরিণত হইল। অঙ্কুর ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপ ধারণ করিল। অদ্য যিনি রক্তপিণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতার ক্রোড়দেশ সুশোভিত করিলেন, দুই দিন পরে তিনিই আবার যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া রমণী-হৃদয় আলোকিত করিলেন; হাসাইলেন, হাসি-

লেন, জগৎ আলোকময় বোধ হইল। ক্রমে সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইলে, বার্দ্ধক্য-জনিত বিবিধ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কালস্রোতে পড়িয়া কোথায় গেলেন তাহার স্থিরতা নাই। আজি সেই কালের প্রভাবে কুমার বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে সকল বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। তিনি আপনাকে মাতৃ পিতৃ হীন অনাথ বলিয়া চিনিয়াছেন।

একদিন কুমার নিজপাঠ গৃহে পড়িতেছেন; দেখিলে বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছেন। ভাবিতেছেন, "মাতৃহীন, পিতৃহীন আমি কে? ইহাঁরা আমাকে আশ্রয় দিলেন কেন?—না হয় আশ্রয় দিয়া আমার উপকার করিয়াছেন—চন্দ্রলেখা কেন আমাকে ভালবাসে? আমিই বা কেন তাহাকে ভালবাসি? আগে যদি জানিতাম চন্দ্রলেখা অন্যের হইবে, তাহা হইলে নির্জ্জনে আজ এমন করিয়া ভাবিতেও হইত না, কাঁদিতেও হইত না। চন্দ্রলেখা এখনত বালিকা! এখন ভালবাসার যথার্থ জ্ঞান তাহার হয় নাই! আর যদি সে আমাকে—আমি যেরূপ তাহাকে নির্জ্জনে ভাবিয়া থাকি সেইরূপ,সে আমাকে না ভাবে, পরিণামে তাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। না, আমি তাহার ভবিষ্যৎ সুখের কণ্টক হইব না। আমি না হয় চিরদিন কাঁদিব, তথাপি তাহার কোমল প্রাণে বেদনা দিব না। আমি নিঃস্ব, অনাথ; আমি তাহাকে কিরূপে সুখী করিব? আহা! চন্দ্রলেখা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে, অতুল-সুখ ভোগ করিবে, আমি তাহাকে তেমন সুখে কিরূপে রাখিব! চন্দ্রলেখা, আমার চন্দ্রলেখা, তবে কি

সে অন্যের হইবে? দারিদ্র্যজনিত-শুষ্ক হৃদয়-সরোবরে সেই সরস প্রফুল্ল কমলিনী থাকিবে কেন! হৃদয়-মরুতে স্নিগ্ধসলিলা প্রবাহিনী বহিবে কেন! ভাগ্যবান্ পতি পাইয়া সেও ভাগ্যবতী হইবে, চিরসুখে সুখী হইবে, তবে আজ হৃদয় কাঁদে কেন? হৃদয়! তুমি পাপের আবাস, তাই তুমি তাহার সুখের কথায় ক্ষুব্ধ হইতেছ!"

কুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা নিঃশব্দ-পদচারণে হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, বালিকা-সুলভ চঞ্চল দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে, কুমারের পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া কোমল কর-কমলে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় চাপিয়া ধরিল। সেই সুকোমল কর-যুগল যে কাহার, তাহা কি কুমার বুঝিতে পারিলেন না? বুঝিতে পারিয়াও কহিলেন "আঃ! কেন সুশীলা বিরক্ত কর!"

সুশীলা চন্দ্রলেখার সঙ্গিনী। সেও কুমারের নিকট প্রায় আসিত। চন্দ্রলেখা কুমারের চক্ষু হইতে হস্তদ্বয় অপসারিত করিয়া কহিল, "কেমন! আজত বলিতে পারিলে না! তুমি কি ভাবিতেছিলে বলিব?"

কুমার। বল না।

বালিকা সরলপ্রাণে বলিল, "আমাকে।"

কুমার। তোমাকে ভিন্ন কি আর আমার ভাবিবার কিছু নাই?

চন্দ্র। আমাকে ভাব নাই? ঠিক্ বল দেখি! তবে আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কহিও না।

কু। না চন্দ্রলেখা! আর আমি আজ হইতে তোমার

সহিত কথা কহিব না। তুমি লক্ষ্মীস্বরূপা! আর তুমি, এই নিঃস্ব, ভাগ্য-হীন, অসহায় কুমারের কাছে আসিও না। আমি সেই কথাই এই ভাবিতেছিলাম।

বলিতে বলিতে কুমারের চক্ষুঃ ছল ছল করিতে লাগিল, অশ্রুজল গণ্ডদেশ বাহিয়া গেল।

এইরূপ দেখিয়া চন্দ্রলেখা স্তম্ভিত হইল, কহিল "আমার কথায় তোমার যাতনা হইবে জানিলে বলিতাম না। আমি রহস্যভাবে বলিয়াছি। কখন আমার কথায় রাগ কর নাই, আজ কেন রাগ করিলে? কাঁদিও না, আমার দিব্য, আমার মাথা খাও, কাঁদিও না। আমার কথায় কি কাঁদিতে আছে! বাড়ীতে কেহ নাই, সেইজন্য তোমার নিকট গল্প শুনিতে আসিয়াছিলাম, এমন জানিলে আসিতাম না।"

এই বলিয়া বালিকা সরল প্রাণে অঞ্চল দিয়া কুমারের মুখ মুছাইয়া দিল।

কু। না চন্দ্রলেখা! আমি তোমার কথায় রাগ করি নাই, কিন্তু তুমি আর আমার নিকট আসিও না। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল; আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমার ভাবী-জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভাবিয়া আমি সুখী; ঈশ্বর করুন তুমি চির-সুখ ভোগ কর। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, কেননা আমার অতীত অন্ধকার, বর্ত্তমান অন্ধকার, সুতরাং ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভাবিয়া আমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই; আমার অন্ধকার সহ্য আছে। তুমি ঐশ্বর্য্যশালিনী, ভাগ্যবানের হৃদয়ানন্দদায়িনী হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর সুখের বিষয় কি আছে?

চন্দ্র। আজ তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইলে আমি কিরূপে সৌভাগ্যশালিনী হইব? তুমি দরিদ্র, হতভাগ্য হইলে আমি কিরূপে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইব? তুমিইত বলিয়াছ স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী; তবে কেন আজ তাহার বিপরীত বলিতেছ?

বালিকা এই কথা বলিয়াই লজ্জায় অধোমুখী হইল।

কৃ। তোমার পিতা ধনবান্ এবং রূপবান্ এক পাত্রের সহিত তোমার পরিণয় দিবেন প্রস্তাব করিতেছেন। তাহাকে পাইয়া তুমি অতুল সুখের অধিকারিণী হইবে। চন্দ্রলেখা! আমি দীন, আমি তোমাকে তেমন সুখে কিরূপে রাখিব?

বালিকা চন্দ্রলেখা কহিল, "আমি বালিকা, আমি তোমার সকল কথা বুঝিতে পারি না, তবে এইমাত্র বুঝিয়াছি যে, যদি কেহ আমাকে সুখী করিতে পারে,—তবে সে তুমি! আমার পক্ষে এজগতে যদি কেহ ধনবান,গুণবান্ ও রূপবান্ থাকে তবে সে তুমি! আমি তোমাকে চাই। তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী হইব ইহা ভিন্ন ঈশ্বরের নিকট আমার আর অন্য প্রার্থনা নাই।"

কৃ। চন্দ্রলেখা! তুমি কিছুই বোঝ না; তুমি যে সুখের পাত্রী, সে সুখ আমার কাছে নাই। বরং পরিণামে আমি তোমার দুঃখের কারণ হইতে পারি। তুমি যে আমার নিকট আসিয়া বস, আমার সঙ্গে কথা কও, বল দেখি, এই সকল পরিণামে তোমার কোমল প্রাণে বেদনা দিতে পারে কিনা? সেইজন্য বলিতেছি আমার কাছে আসিও না।

চন্দ্র। তুমি যতই বল, যতই বোঝাও, আমি তোমার নিকট আসিতে ছাড়িব না। আমি নিদ্রাবেশে কতবার তোমার এই দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছি! মালা গাঁথিয়া পদপ্রান্তে দিতে যাইয়া ভুলিয়া কতবার তোমার গলায় দিয়াছি। আমার সেই দেব! সেই নিদ্রিতাবস্থার দেব! জাগ্রতাবস্থার আনন্দপূর্ণ চিত্ত-স্নিগ্ধ-কর উজ্জ্বল রত্ন! আমি তোমাকে পূজা করিতে শিখিয়াছি—তুমি আমার পূজ্য; সেইজন্য তোমার নিকট আসি। আমাকে আসিতে নিষেধ করিও না।

কু। চন্দ্রলেখা! লেখা পড়া শিখিয়া আমার কথা বুঝিতে পারিলে না? আচ্ছা না পার ক্ষতি নাই, আমি জোর করিয়া তোমাকে কাছে আসিতেও দিব না বসিতেও দিব না,—কি করিবে?

চন্দ্র। দেখ, তোমাকে না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, সেই জন্য না আসিয়া থাকিতে পারি না। জোর করিয়া তাড়াইয়া দিবে? কাছে বসিতে দিবে না?

এই বলিয়া চন্দ্রলেখা কুমারের ক্রোড়-দেশে উপবেশন করিল। কুমারের মুখে আর কথা নাই। কুমার অপ্রতিভ।

চন্দ্রলেখা অতি শৈশবকাল হইতে কুমারের সহিত এইরূপ ক্রীড়া এবং তামাসা করিয়া আসিতেছে। প্রণয়ের চক্ষে উভয়েই উভয়কে দেখিয়াছে, সুতরাং চন্দ্রলেখা সেই আবহমান নির্দ্দোষ আমোদের অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

কুমার ভাবিলেন, "বালিকা চন্দ্রলেখা এত কথা কেমন করিয়া শিখিল! চন্দ্রলেখা আজ আমাকে নিরুত্তর করিল!"

চন্দ্র। নীরব হইলে যে? দাও, উঠাইয়া দাও দেখি

এখনি ঠাকুর মাকে যাইয়া বলিব "কুমার আমাকে আর ভাল বাসে না।"

কুমার পরাজিত হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন "না না তোমাকে আর উঠাইয়া দিব না; আর আসিতে নিষেধ করিব না।"

চন্দ্র। তবে সেই শকুন্তলার গল্পটী বল। সে দিন যত দূর হইয়াছে তাহার পর হইতে বল।

কুমার অগত্যা গল্প আরম্ভ করিলেন "তাহার পর শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের গলায় মালা দিলেন, তাঁহাদের গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ হইল; বিবাহের পর তাঁহারা কিছুদিন দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিলেন।"

চন্দ্রলেখা গল্পে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাম্পত্য সুখ আর গান্ধর্ব্ব বিবাহ, কাহাকে বলে?"

কুমার কহিলেন, "জায়া এবং পতি, দম্পতী; তাহাদের যে সুখ তাহাকেই দাম্পত্য-সুখ কহে আর গান্ধর্ব্ব বিবাহ"—

অমনি চন্দ্রলেখা বাধা দিয়া কহিল "কি বলিলে ফের বল, আমি শুনি নাই।"

কু। 'জায়া এবং পতি, দম্পতী; ইহাদের যে সুখ, তাহাকেই দাম্পত্য-সুখ কহে।

চন্দ্র। জায়া আর পতি, ইহাদের সুখ! বুঝিয়াছি। বিবাহ হইলেই পতিকে পাইয়া মনে মনে যে সুখ—এই না?

চন্দ্রলেখার এই কথা শেষ হইয়াছে অমনি কে যেন ...রে ডাকিল "সই!"

চন্দ্রলেখা শশব্যস্তে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুশীলা। চন্দ্রলেখা সুশীলার হস্ত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল "সই! আজ দেখাইব!"

সুশীলা কহিল "কি দেখাইবে ?"

চন্দ্র। "কি দেখাইব ? দেখাইব সেই হাসি!

এই বলিয়া চন্দ্রলেখা ধীরে ধীরে সুশীলাকে ধরিয়া কুমারের কোলে বসাইয়া দিল, এবং হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। লজ্জাশীলা সুশীলাও হাসিতে হাসিতে চন্দ্রলেখার অনুসরণ করিল।

এ সংসারে অনেকেই অকাতরে ধন মানের অংশ দিতে পারে কিন্তু কোন্ রমণী, ইচ্ছা করিয়া আপনার ভালবাসার অংশ অপর রমণীকে দিতে চেষ্টা করেন ? তবে কি চন্দ্রলেখার এ বাল্য খেলা ? না, ইহা চন্দ্রলেখার বাল্য খেলা নয়, স্বভাব চাঞ্চল্যের সামান্য কার্য্যও নয়, ইহা সরলার ভাবী ঔদার্য্যের প্রথম-দৃষ্টান্ত। যদি তুমি সকল পদার্থের অংশ দিয়া উৎকৃষ্টপদার্থটী স্বয়ং উপভোগ করিলে, তবে কে তোমাকে উদার বলিবে ? তাহা হইলে তোমার সারল্য কই ? যাহাকে তুমি ভাল বাস, আর কেহ তাহাকে ভালবাসিলে যদি তুমি দুঃখিত হইলে, তবে তাহার প্রতি তোমার প্রকৃত ভালবাসা কই ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০::০—

অস্তমিত-শশী।

"অহো বিধাত স্তব ন ক্বচিদ্দয়া,
সংযোজ্য মৈত্রীং প্রণয়েণ দেহিনাং।
তাংশ্চাকৃতার্থান্‌বিনিযোজ্য পার্থকং,
বিচেষ্টিতং তেহর্ভক-চেষ্টিতং যথা॥"

কুমার পরদিন উষাকালে দ্বারকেশ্বর নদীতীরে মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় জনৈক অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন "মহাশয়! এ গ্রামে কুমার সিংহ নামে কেহ আছেন কি?"

কুমার বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে অশ্বারোহীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "কুমার সিংহ কি আপনার পরিচিত? তাহার নিকট কি আবশ্যক?"

অশ্বারোহী কহিলেন "তিনি আমার পরিচিত নহেন কিন্তু আবশ্যক যে কি সে কথা তাঁহাকেই বলিব।"

কুমার। যদি আমার নামই কুমার সিংহ হয়?

অশ্বারোহী কুমারকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "তবে আপনাকেই আবশ্যক জানাইব।"

কুমার। আমারই নাম কুমার সিংহ। এ গ্রামে আর কাহারও নাম কুমার নাই।

অশ্বারোহী আর কোন কথা না বলিয়া উষ্ণীষ হইতে

একখানি লিপি খুলিয়া কুমারের হস্তে দিলেন। কুমার লিপি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,——

"স্বস্তি, বৎস কুমার! যদি আত্মীয় পরিজনকে দেখিতে বাসনা থাকে, অনতিবিলম্বে লিপি বাহকের অনুগমন করিও। কাহাকেও এ কথা বলিও না। আমার নিকট আসিলে সকল সন্দেহ দূর হইবে। সকল-কামনা পূর্ণ হইবে। লিপি বাহককে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইও না।"

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসনাতন গোস্বামী।

কুমার পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন "একি! জীবন কি পরিবর্ত্তনশীল! সনাতন গোস্বামী কে? আত্মীয় পরিজন! কামনা পূর্ণ হইবে! কিসের কামনা? তবে কি চন্দ্রলেখা আমার হইবে? কোথায় যাইব?—

অশ্বারোহী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন "তবে আর বিলম্ব কেন? চলুন।"

কুমার চিন্তা করিয়া কহিলেন "যাইব কিন্তু——"

অশ্বা। কিন্তু কি?

কু। কিন্তু কখন যাইতে হইবে?

অশ্বা। এই দণ্ডেই।

কু। তবে আপনি এই স্থানে ক্ষণিক অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসিতেছি।

অশ্বা। উত্তম, কিন্তু যেন বিলম্ব না হয়।

কুমার দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখন

তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখনও আকাশে চন্দ্র বিভাসিত। তখনও ধরা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় নাই। ক্ষীণান্ধকার তখনও জগৎকে ঢাকিয়াছিল। বায়সের কর্কশ কণ্ঠ তখনও সীমন্তিনীগণকে পতির অঙ্ক ত্যাগ করিয়া গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য ডাকিতেছিল। কুমার গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিলেন চন্দ্রলেখা সুশীলার সুকুমার শিশু ভ্রাতাকে ক্রোড়ে করিয়া বহির্দ্বারে সোহাগ করিতেছে। নিকটে আসিয়া মলিন মুখে কহিলেন "চন্দ্রলেখা!" কুমারীর ক্রোড় শোভিত অবোধ শিশু, পিতা ভ্রমে হস্ত প্রসারণ করিয়া আধস্বরে বলিল "বাবা!" কুমারী অপ্রতিভ হইয়া লজ্জায় মুখ নামাইল। হৃদয়-কন্দর আলোড়িত করিয়া অপার আনন্দ, কোমল অধরোষ্ঠে মৃদু হাস্য রূপে দেখা দিল। কিন্তু যে স্বরে কুমার "চন্দ্রলেখা" বলিয়া নীরব হইলেন, বালিকা বুঝিল সে স্বর আবেগপূর্ণ, যেন কোন হৃদয় বিদারক কথা তাহার পর লুপ্ত আছে। আবার কুমার অস্ফুটস্বরে বলিলেন "চন্দ্রলেখা!" আর কথা বাহির হইল না। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কুমারী দেখিল তাঁহার গণ্ডদেশ বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। চন্দ্রলেখা চমকিতা হইয়া বলিল "একি কুমার! কাঁদ কেন?

কুমার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; বালিকার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; যেন জন্মের সাধ দেখিয়া লইতেছেন। এই রূপে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "চন্দ্রলেখা! ভাবিও না, আমার জন্য কাঁদিও না; যদি ঈশ্বর দিন দেন, আবার আসিয়া দেখা করিব।"

সহসা এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া চন্দ্রলেখা আকুল প্রাণে

জিজ্ঞাসা করিল "আজ তোমার এ ভাব কেন? একি কথা বলিতেছ? কি হইয়াছে? কোথায় যাইবে?"

কু। সে অনেক কথা। আসিয়া বলিব। আপাততঃ গৃহ-ত্যাগ করিয়া চলিলাম। যাইলে কামনা পূর্ণ হইবে থাকিলে বিভ্রাট ঘটিবে।

চন্দ্রলেখা নিরুত্তর—স্তম্ভিত; হৃদয়ে অসহনীয় তরঙ্গবেগ, —মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাবে?"

কু। সে কথা বলিতে পারি না।

এই বলিয়া, দক্ষিণ করে চন্দ্রলেখার চিবুক ধরিয়া আবার কহিলেন "চন্দ্রলেখা! আমাকে কি কখন ভাবিবে?"

বালিকা উত্তর দিল না। এ কথার উত্তরই বা কি! মনে মনে ভাবিল "ভাবিব কি না ঈশ্বর জানেন।"

বিলম্ব হইতেছে ভাবিয়া কুমার কিছু ব্যস্ত ভাবে কহিলেন "আর যদি না আসিতে পাই এক এক বার ভাবিও। যত দিন পারিবে মনে রাখিও। তাহার পর যখন তুমি অন্যের—— আমাকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিও। আর আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার এই সরলতাময় বদনেন্দু চিত্তপটে আঁকিয়া রাখিব। তবে আসি।"

কুমার চলিল; চন্দ্রলেখার মাথা ঘুরিল। জগৎ অন্ধকার হইল। সংসার অরণ্য হইল। অশ্রুপরম্পরায় চক্ষু দুটী ডুবিল। কিছুই নয়ন গোচর হইল না। কতক্ষণ পরে চক্ষু মিলিয়া চাহিয়া দেখিল, দেখিল কুমার নাই। আর একবার দেখিবে বলিয়া বালিকা ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে নদীতীরে

দৌড়িয়া আসিল। দেখিল, জগৎ সংসার শূন্য করিয়া চাঁদের সঙ্গে কুমার পলাইয়াছে—সূর্য্য উঠিয়াছে।

—০:§:০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:§:০—

নদী-তীরে।

ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনা-মঞ্জু-কুঞ্জং জগাম॥"

পদাঙ্কদূত।

"সরলা অবলা বালা চঞ্চলা কেনরে?
দাঁড়াইয়া নদীতীরে কেন ভিতে অশ্রুনীরে,
বারে যায় বারে চায় ভাবে কার তরে?
সরলা অবলা বালা চঞ্চলা কেনরে?

দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালা কার তরে কাঁদে?
কভু কি যন্ত্রণা জানে, তবে কেন ভাবে প্রাণে?
কিম্বা পা দিয়াছে কা'র প্রণয়ের ফাঁদে,—
কুমুদী বিহ্বলা যথা হেরিবারে চাঁদে॥"

যোগেন্দ্র।

আজ চন্দ্রলেখা বড়ই অসুখী। মুখমণ্ডল মলিন। চক্ষু দুটী ছল ছল। নদীতীরে কুসুম কাননে যাইয়া হতাশ-চিত্তে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেছে, যেন মহামূল্য কণ্ঠরত্নহারটী হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অন্বেষণ করিতেছে। পাঠক, কি ভাবিতেছেন

চন্দ্রলেখা কুমারের জন্য কাঁদিতেছে? তাহাও কি সম্ভব? দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা যুবকের জন্য কাঁদিবে কেন? তাহার হৃদয়েত এখনও প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই। অথবা প্রণয়ের কথা কে বলিতে পারে? যদি প্রণয়ই মনে করেন, তবে বলুন দেখি ইহা কি সেই প্রণয়? যে প্রণয়ের জন্য আপনি, আপনি কেন এই সংসারের যাবতীয় লোকই লোলুপ, ইহা কি সেই প্রণয়? যদি তাহাই হয়, তবে কয় জনার জন্য এরূপ দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে?

কুমারের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রলেখার সকল সুখ আজ ভাসিয়া গিয়াছে। দুইজনে বেড়াইতে আসিয়া যে নীলাম্বরে সুধা-করকে সুধারাশি ছড়াইতে দেখিত আজ সেই নীলাম্বরে মেঘ গুড়গুড় করিয়া ডাকিতেছে। যে বায়ু নানারূপ পুষ্প হইতে সুগন্ধ অপহরণ করিয় তাহাদিগকে একদিন উপহার দিয়াছে, সেই বায়ু আজ চন্দ্রলেখার আলুলায়িত কেশপাশ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সন সন শব্দে বহিতেছে। যে গগনে একদিন সূর্য্যদেব বিচিত্রবর্ণে আপন রূপের ছটা দেখাইয়া অস্ত যাই-তেন সেই গগনে একটা কালমেঘ আসিয়া অধিকার করিয়াছে। যে বৃক্ষে পিকবর বসিয়া কুহু কুহু রবে জগৎ মাতাইত, সেই বৃক্ষে কাল পেচক বসিয়া অমঙ্গলসূচক বিকৃতস্বরে ডাকিতেছে।

আজ চন্দ্রলেখার চিন্তার শেষ নাই। যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া নদীকে উন্মার্গগামী করে, তেমনি বালিকার হৃদয় চিন্তা-পরম্পরায় আকুলিত ও ব্যথিত হইতে লাগিল। বালিকা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আত্মহারা হইল। বাল্যকালের

কথাগুলি একে একে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতে লাগিল। একদিন কুমারের নিকট পাঠ দিবার সময় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সব ভুলিয়া গিয়াছিল। একদিন কুমার তাহার জন্য কমলফুল তুলিতে গিয়া জলমগ্ন হইয়াছিল। চন্দ্রলেখা নিদ্রিত থাকিলে কুমার নিঃশব্দপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহার নিদ্রাবস্থার বদন-সৌন্দর্য্য দেখিতে ভাল বাসিতেন; একদিন চন্দ্রলেখা জাগিয়া উঠিলে কুমার অপ্রতিভ হইয়া সহাস্যবদনে দ্রুতপদে গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রলেখার সঙ্গে বিবাদ করিয়া একদিন কুমার নদীর ধারে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, চন্দ্রলেখা গোপনভাবে নিকটে গিয়া হস্তধারণ করিলে তাঁহার ক্রোধ সম্বরণ হইয়াছিল। একদিন, এই অল্পদিন হইল, কুমারের কোলে বসিয়া চন্দ্রলেখা এক রাজা ও তাঁহার দুই রাণীর গল্প শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হুঁ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল; আবার তখনই মনে হইল "কেন সেই ফুলের মালাটী গলা হইতে খুলিয়া লইয়াছিলাম।"

এই কি একদিন? এমন কত দিন, এই নদীর তীরে আসিয়া চন্দ্রলেখা, কুমার যে দিকে চলিয়া গিয়াছেন, সেই-দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। দূর হইতে কাহাকেও কতকটা সেইরূপ সুন্দর দেখিতে পাইলে কখন কখন কুমার বলিয়া তাহার ভ্রম হইত। সেই ব্যক্তি নিকটে আসিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে বসিত।

তাহার পর বর্ষা আসিল। দ্বারকেশ্বর কুল কুল করিয়া বহিত লাগিল। চাতক সন্তাপিত প্রাণে বারিদ সন্নিধানে ছুটিল; শস্যক্ষেত্র জল শূন্য হইল। কৃষকের মনে আনন্দ

বাড়িল। বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত ইত্যাদি ঋতুগুলি আপন আপন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রলেখার হৃদয়ে বর্ষার কলুষিতা নদী সেইরূপ তরঙ্গিতাই রহিল। আর কিছুতেই উপশম হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যোগভূমি।

"দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি———
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী॥"

মেঘনাদ বধ।

এক অশ্বের পৃষ্ঠে উভয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলেন। সেইস্থান হইতে অশ্বারোহী কুমারকে অপর একটী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন। অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে কুমার অশ্বারোহীকে কহিলেন "মহাশয়! কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব, বাধা না থাকিলে বলিবেন কি?"

অশ্বা। কি কথা বলুন, বলিবার হইলে অবশ্য বলিব।

কু। আপনি কে? এরূপ সৈনিক বেশে কোথায় আসিয়াছিলেন, আবার কোন্ স্থানেই বা যাইতেছেন? আপনার নাম কি?

অশ্বা। আমি পূর্ব্বে মারবারাধিপতি রাজা যশোবন্তের

একজন প্রিয়পাত্র ছিলাম। সম্রাট্ কর্ত্তৃক রাজার মৃত্যু হইলে আমাকে সম্রাট্ আওরংজেব, সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি কোন কার্য্য বশতঃ বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিলাম। কার্য্য সমাধা হইয়াছে; আবার দিল্লীতেই প্রত্যাগমন করিতেছি। আমার নাম নাহুর খাঁ।

কু। "নাহুর খাঁ" মুসলমানের নাম থাকিতে পারে কিন্তু আপনাকে হিন্দু দেখিতেছি। সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন কি?

অশ্বা। তা নয়, আমার নাম মুকুন্দ দাস। নাহুরখাঁ, সম্রাট প্রদত্ত উপাধি মাত্র।

কু। সে যাহা হউক আপনি যখন প্রভুহন্তার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন আপনি প্রভুভক্তির বিপরীত আচরণ করিয়াছেন।

এই কথা বলিয়া কুমার অশ্বারোহীর দিকে তীব্র অথচ ঘৃণা সূচক দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অশ্বারোহী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "যুবক! আমি প্রভুভক্ত না হইতে পারি কিন্তু আমি সম্রাট আওরংজেবের শক্র। তোমাকে বলিলে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, অতএব বলি শুন। যে দিন রাজা যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের ঈর্ষানলে দগ্ধ হইলেন, সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিলাম "মুসলমান রক্তে হস্ত কলুষিত করিয়া পাষণ্ড আওরংজেবকেও আমার সেই প্রভুর পথে প্রেরণ করিব।" সেইজন্য কৌশলে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। প্রথমতঃ কয়েকটী কার্য্যে বিশ্বাস জন্মাইয়া অবশেষে তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। সাবধান এ কথা যেন প্রকাশ না পায়।"

কু। উত্তম কথা, কিন্তু ইহাওত বিশ্বাসঘাতকতা।

অশ্বা। তা না হইলে প্রতিজ্ঞা রক্ষার আর কোন উপায় দেখিলাম না।

এইরূপ উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তায় তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে চলিলেন। আমরা এইস্থানে মুকুন্দদাসের পরিচয় দিব।

যে সকল সামন্ত রাজা যশোবন্তের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তাহাদের মধ্যে মুকুন্দ দাস সর্ব্ব প্রধান।

মুকুন্দ দাসের আর একটী নাম নাহুরখাঁ হইল কেন? তাহার কারণ এই ঃ—কথিত আছে সম্রাট্ আওরংজেব এক সময়ে কোন কারণে মুকুন্দ দাসকে নিরস্ত্র হইয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখ-বর্ত্তী হইতে আদেশ করেন। নির্ভীক মুকুন্দ অম্লানবদনে তাহাই করিলেন; তাঁহার তীব্রদৃষ্টি ব্যাঘ্রের চক্ষুর উপর পড়িল। মানব সিংহের জলন্ত দৃষ্টিতে ভীত হইয়া ব্যাঘ্র মুখ ফিরাইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। দর্শকবর্গ সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়া রহিল। নিষ্ঠুর আওরংজেবের পৈশাচিক উদ্দেশ্য সফল হইল না। তিনি তাঁহাকে নানাবিধ পুরস্কার দিলেন এবং নাহুরখাঁ অর্থাৎ ব্যাঘ্রপতি উপাধি প্রদান করি-লেন। সেই হইতে তিনি নাহুরখাঁ নামে অভিহিত।

মুকুন্দদাস ও কুমার তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণ সময়ে দিল্লীর অনতিদূরবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। সেই বৃক্ষ সংলগ্ন যে একটী নিবিড় বন ছিল তাহার নাম "যোগভূমি" এক্ষণে তাহার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

মুকুন্দদাস এবং কুমার অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম লাভার্থ উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা তাঁহারা দেখিলেন এক জ্যোতির্ম্ময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পক্ব-শ্মশ্রু, ললাট-ত্রিবলী, যজ্ঞোপবীত এবং তেজোময় সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মুকুন্দ দাস তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারণ করিলেন। কহিলেন "বৎস, অচিরাৎ তোমার উদ্দেশ্য সফল হউক।"

কুমার বিনীতভাবে ঐরূপ প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহার মস্তকে দক্ষিণ কর আরোপিত করিয়া কহিলেন "বৎস কুমার! তোমাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি তোমার বাসনা পূর্ণ হউক।"

অপরিচিত ব্রাহ্মণের মুখে কুমার, স্বীয় নাম শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিস্মিত দেখিয়া কহিলেন "বৎস, আমাকে তুমি চিনিতে পারিবে না কিন্তু তুমি আমার পরিচিত। লিপির নিম্নে যাহার নাম স্বাক্ষর ছিল, আমিই সেই সনাতন গোস্বামী। এখন কোন বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইও না। একদিন তোমার ঔৎসুক্য নিবারণ করিব। অদ্য হইতে বৎসরান্তে শুক্ল পৌর্ণমাসীতে এই বনভূমিতে আসিও। বনভূমির মধ্যে একটী অট্টালিকা দেখিবে, তাহারই নিকট আমার উপাসনা মন্দির, সেই মন্দিরে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এক্ষণে আমার আদেশমত মুকুন্দের সঙ্গে দিল্লীতে যাও। তথায় যত্ন সহকারে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা কর। এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সনাতন গোস্বামী যোগভূমিতে প্রবেশ করিলেন। মুকুন্দদাসের সহিত কুমার দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সলিলে কুসুম।

"বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিতচকিতৈ স্তত্র পৌরাঙ্গনানাং,
লোলাপাঙ্গৈ র্যদিন রমসে লোচনৈ র্বঞ্চিতোঽসি॥"

মেঘদূত।

"কেয়ং ভবিষ্যতি বিনিদ্র সরোরুহাক্ষী,-
কামস্য কাপি দয়িতা তনুজাঽনুজাবা।
এনাং বিলোকয়তি যস্তরুণ স্তদানীং,
কামস্ত মস্তকরুণ স্ত্বরিতং নিহন্তি॥"

দেখিলা সম্মুখে বলী————
অবগাহে দেহ, স্বচ্ছ সরোবরে, কৌমুদী
নিশিতে যথা——অবয়ব বিমল
সলিলে, মানস-সরসে মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা!

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল। আজি পূর্ণিমা তিথি। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক যোদ্ধৃবেশে অশ্বারূঢ় হইয়া

পার্ব্বতীয় প্রান্তর দিয়া বনভূমির দিকে যাত্রা করিলেন। অশ্ব বেগে চালিত হইয়া শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইল। যে কোন এক দিক দিয়া তিনি সেই যোগভূমির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাঠককে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে ইতিহাসে যে সত্ত্বরামী হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা পাঠকরা যায় তাঁহারা এই যোগ ভূমিতে বাস করিতেন।

যুবক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার কোন নিশ্চিত পথ পাইলেন না। কিয়দ্দূর গমন করিলে প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব শোভা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। তখন সান্ধ্য সমীরণ বহিতেছিল। বৃক্ষপত্র ধীরে ধীরে নড়িতেছিল। যুবক দেখিলেন একটী স্বচ্ছসলিল সরোবর বনভূমির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে।

সরোবরের সোপান-পংক্তি শ্বেত প্রস্তর-গঠিত এবং বারিনিহিত সোপানের প্রস্তর নিচয় স্থানে স্থানে শৈবালাচ্ছাদিত। সরোবরের চতুর্দ্দিক শ্যামল বিটপি-শ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত; এবং নানা জাতীয় পক্ষী-কুলের অস্ফুট মধুর ধ্বনিতে স্থানটী পরিপূরিত। তাহার একপার্শ্বে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান হইতে নিয়ত সুগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে। দেখিলেই বসন্তের আবাস স্থান বলিয়া ভ্রম জন্মে। সরোবরে কয়েকটী পুষ্প ভাসমান রহিয়াছে। ভাসমান পুষ্প গুলিকে দেখিলে একটী নূতন কথা মনে পড়ে।

মলয় পর্ব্বত চন্দন তরুতে সমাচ্ছন্ন। কথিত আছে বিষধরেরা চন্দন বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া থাকে। মলয় পর্ব্বত আশীবিষের আবাস স্থান; মলয় সমীরণ শীতল হইলেও বোধ করি সেই জন্য বিষাক্ত; নতুবা মলয়ানিলস্পর্শে গাত্র জ্বালা উপস্থিত হয় কেন? যুবক যুবতীর অন্তর্দাহ উৎপাদন করে কেন? বোধ হইতেছে, কুসুম কামিনী সেই মলয়ানিলে জ্বালাতন হইয়াই যেন জলে পতিত হইয়াছে।

যুবকের দৃষ্টি স্বচ্ছজলে পতিত হইলে তিনি দেখিলেন সরোবরে কয়েকটী ফুল ভাসিতেছে এবং জল-কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। যেন সন্ধ্যাগমে কুসুম-কামিনী হৃদয়চাঁদ চাঁদকে দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে সাদর সম্ভাষণ মানসে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে আরও দুইটী কুসুম ভাসমান দেখিলেন। এদুটীকে দেখিয়া যুবক চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন একটী প্রস্ফুটিত চম্পকের ন্যায় না লোহিত, না হরিত, না শ্বেত অথচ যেন তিনই মিশ্রিত। তাহার রূপে সরোবর আলোকিত হইয়াছে।

পাঠক! এ কুমুদিনীও নহে কমলিনীও নহে। এটী গৃহ উদ্যানের মুকুলিত সরস সৌরভপূর্ণ বসন্তের বনফুল। এ ফুলের তুলনা আর কি দিব। কাহারও সখের উদ্যানে কেহ যদি কখন এ কুসুম ফুটিতে দেখিয়া থাকেন—যে কুসুম বারমাস প্রস্ফুটিত থাকিয়া বারমাস সমভাবে সৌরভ বিস্তার করে,—যে কুসুম পরিমলপূর্ণ উন্নত বক্ষে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠন মধ্যে মধুমাখা সলজ্জভাবে প্রিয়জনের মুখপানে অনিমিষ নয়নে

চাহিয়া থাকে,—যে কুসুম প্রণয়ীর অঙ্গুলিস্পর্শে সরমে মরিয়া সরিয়া গিয়া সতৃষ্ণ নয়নে বারেক চাহিয়া সহাস্য বদনে একপার্শ্বে সঙ্কুচিতা হইয়া দাঁড়ায়—যে কুসুমের কুসুম-কোমল নয়নযুগল আরও মনোহর, সেই কুসুম কেহ যদি কখন হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন তবে তিনিই বুঝিবেন ইহা সেই স্বর্গীয় কুসুম!! অপর পুষ্পটী বোধ হইতেছে একদিন প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু এখন সে সুগন্ধ ফুরাইয়াছে, কেননা রস শুখাইয়াছে। দ্বিতীয়টী প্রথমটীর সহচরী বলিয়া বোধ হইতেছে।

এদুটী কি ফুল? এ ফুলের মালা কি কখন পরিয়াছেন? বলুন দেখি, এ ফুল দুটীকে মনোহারিণী কামিনী ফুল বলে কিনা? কি দরিদ্র কি ধনী, কি রাজা কি প্রজা সকলেরই গৃহ উদ্যানে এই কামিনী কুসুম প্রস্ফুটিত। সে উদ্যান সৌরভে আমোদিত।

কুমার বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া তাহাদের জলকেলি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, নবযুবতী আপন দেহতরণী খানি একবার জলে ভাসাইতেছিল একবার ডুবাইতেছিল। তৈল যেমন জলে মিশ্রিত হয় না, তেমনি তাহার লাবণ্য জলে মিশ্রিত না হইয়া যেন ভাসিতেছিল। মৃনাল-বিনিন্দিত বাহু যুগল তরণীর দাঁড় রূপে জল দুফাল করিতেছিল হস্ত-বলয়ের মধুর শিঞ্জন জলমধ্যে যেন সুমধুর [illegible] ধ্বনি বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেহ তরণীর চাঞ্চল্য নিবন্ধন বক্ষঃ হইতে বস্ত্র স্খলিত হওয়ায় স্তনমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া যেন মৃদঙ্গের তালে তালে নাচিতেছিল, এবং সরোবর বারি

সেই ধ্বনিতে মাতোয়ারা হইয়া তরঙ্গচ্ছলে নাচিতে নাচিতে স্তনমণ্ডলের উপর ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। কেশপাশ আলু থালু হইয়া তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতে দুলিতে জলে যেন খেলিতেছিল। এরূপ দৃশ্যে যুবক চিত্ত কিরূপ হয়?

নবম পরিচ্ছেদ।

আশাতরু।

"———দয়িতোঽনুগম্যতাং,
পরানুশেতে তব চঞ্চলং মনঃ।"

ভারবি।

"প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া———।"

জয়দেব।

"পীরিতি সুখের সাগর দেখিয়া নাহিতে নামিনু তায়,—
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুখের বায়।
———সখি! কেন বা এমন হইল!"

চণ্ডীদাস।

রমণী দ্বয়ের কথা বার্ত্তার ভাবে বোধ হইল কনিষ্ঠার নাম রত্নমালা এবং জ্যেষ্ঠার নাম ইন্দুমতী। বয়োজ্যেষ্ঠা বলিল দেখ রত্নমালা! গোস্বামীর মুখে শুনিলাম আজ একজন

রাজপুতকুমার এখানে আসিবেন। শুনিলাম তিনি তোমার রক্ষা ভার গ্রহণ করিবেন। সম্রাটের ভয় হইতে তুমি নিষ্কৃতি পাইবে। তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল, হয়ত তিনিই তোমার প্রাণেশ্বর হইবেন।"

রত্ন। তিনি কোথা হইতে আসিবেন? আমার রক্ষা ভার তিনি কেন লইবেন? আমি কখনত কাহারও কোন উপকার করি নাই।

এই কথা বলিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন "আমাকে গ্রহণ করিবেন! আমার প্রাণেশ্বর হইবেন! বনবাসিনী হত-ভাগিনীর ভাগ্যে তত সুখ কি ঘটিবে?"

ইন্দু। দেখ রত্নমালা! যখন আমরা স্নানে আসি তখন তোমার বাম চক্ষু নাচিতেছিল; তোমাকে তখন কত তামাসা করিয়াছিলাম। দেখ, এখন আমারও বাম চক্ষু নাচিতেছে। বোধ করি আমাদের কোন ইষ্টলাভ হইবে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিল। যুবক ভাবিলেন "গোস্বামী নিশ্চয়ই ইহাদের পরিচিত; অতএব ইহাদের অনুগামী হইলে ম‌ উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্তু গুপ্তভাবে যাওয়া অ প্রকাশ্যে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত।"

এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি রমণীদ্বয়ের সম্মুখে উ স্থিত হইলেন। অকস্মাৎ সশস্ত্র পুরুষকে সম্মুখে দে উভয়েই চমকিতা ও ভীতা হইলেন। যুবক তাহাদিগকে তদ দেখিয়া মধুর-স্বরে-নম্র-ভাবে কহিলেন "আমাকে দেখিয়া আপ নারা ভীতা হইবেন না আমার দ্বারা আপনাদের কোন রি

অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। পথ অবগত নহি, সেইজন্য আপনাদের সাহায্য পাইবার আশায় নিকটে আসিয়াছি।"

ইন্দু। মহাশয়! আপনাকে সশস্ত্র দেখিয়া আমাদের ভয় হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার কথায় সে আশঙ্কা দূর হইল।

রত্নমালা সহচরীর পার্শ্বে আসিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, রত্নমালার এভাব কেন? তাহার উত্তর, স্ত্রীজাতি একেই স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা; বিশেষে অপরিচিত যুবক সন্নিধানে যুবতীর লজ্জা অতি সুলভ; সুতরাং এরূপ স্থলে যুবতী মাত্রেই যে অবনতমুখী হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অথবা ইহাও হইতে পারে, যুবকের নয়ন-জ্যোতিঃ, প্রভাকরের সমুজ্জ্বল কিরণের ন্যায়; কি জানি যদি কিরণ-সংস্পর্শে হৃদয় পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হয়, এই আশঙ্কায় সুমুখী নিজ মুখশশী অবনত করিয়া কমলিনীর বিকাশ-শঙ্কা বিদূরিত করে।

যুবকের মোহনমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া রত্নমালা চমৎকৃত হইলেন। সন্ন্যাসীদের যোগভূমি, এই বনভূমিতে যদিও তিনি অনেক সন্ন্যাসী যুবক অবলোকন করিয়াছেন কিন্তু এরূপ হৃদয় উত্তেজক মোহনমূর্ত্তি সন্দর্শন তাঁহার জীবনে এই প্রথম।

রত্নমালা একবার যুবকের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে সরলদৃষ্টি করিয়া পরক্ষণেই মুখ নামাইলেন। ক্ষণপরে আবার একবার বক্রদৃষ্টি। এ দৃষ্টিপাত অনেক কৌশলে সম্পন্ন হইল। বদন আবার অবনত হইল। কুমারী যেন যুবকের মোহনরূপ চিত্তপটে আঁকিতেছেন।

একে সুন্দরী তাহাতে লজ্জাশীলা। লজ্জাভিভূতা যুবতীতে

এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দৃষ্ট হইল। কুমার তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মনে মনে রূপের প্রশংসা করিলেন কিন্তু বিমোহিত হইলেন না। চন্দ্রলেখা-পূর্ণ হৃদয়ে সে মূর্ত্তি স্থান পাইল না।

ভাবিয়াছিলাম পাঠক মহাশয়কে আমরা এইস্থানে রত্ন-মালার অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত যৌবনের মোহিনী মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দেখাইব, কিন্তু হইল না। সে মূর্ত্তি, সেরূপ রূপ যে চিত্রকর চিত্রিত করিয়াছেন তিনি ভিন্ন আর কাহারও আঁকি-বার সাধ্য আছে কিনা জানি না। রূপ-বর্ণন করিতে হইলে যে যে গুণের প্রয়োজন আমাদের তাহা নাই। আর এক কথা, রত্নমালার বয়ঃক্রম কত জানিনা। তবে এইমাত্র বলিতে পারি রত্নমালা যে সময়ের প্রস্ফুটিত কুসুম, তখন ষোড়শবর্ষে স্ত্রীলোকের যৌবন শেষ হইত না। মুকুলিত হইতে না হইতে পুরুষ-পরেশ স্পর্শে সরস কামিনী শুকাইত না। তখন মুখমণ্ডলে বালিকা ভাব থাকিতে থাকিতে অবয়বে প্রৌঢ়াভাব পরিদৃষ্ট হইত না। প্রথমজাত নবপ্রসূত সন্তান ক্রোড়ে করিয়াই নববধূ অবগুণ্ঠনের অবমাননা করিত না। রত্নমালার ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু সাময়িক নিয়মে রত্নমালা তখনও বালিকা। তখনও বদন লাবণ্য বাল্যসুলভ সরলতার পরিচয় দিতেছিল।

পাঠক! যদি অমাবস্যার সূচিভেদ্য গা অন্ধকার এবং পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের যুগপৎ একত্র আবির্ভাব দেখিবার বাসনা থাকে তবে একবার রত্নমালার পৃষ্ঠদেশ-বিলম্বিত তরঙ্গায়মান অলকদাম এবং সেই শারদীয় বদন-সুধাংশু মনে ম

ধারণা করুন। আর যদি কোকিলকণ্ঠ-নিনাদিত বসন্তকালে, প্রাবিটসম্ভূত বিদ্যুদ্দাম-দীপ্ত সরোবরে সফরীর চঞ্চলগতি দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মে, তবে একবার কোকিলকণ্ঠী রত্নমালার যৌবন-বসন্তে, লাবণ্য-সরোবরে ভাসমান যে দুইটী নয়ন, বিদ্যুৎবৎ দৃষ্টিতে যুবককে বিমোহিত করিতেছিল সেই নয়ন দুইটী মনে করুন। পূর্ণশশাঙ্ক অকলঙ্ক হইয়া আলিঙ্গন করিলে কুমুদিনী কেমন হাসি হাসিয়া প্রাণকান্তকে পরিতুষ্ট করিত, যদি সে হাসি দেখিবার বাসনা থাকে, তবে অবগুণ্ঠন মধ্যে রত্নমালার রক্তাভ-বিম্বাধরে, যে বিমল মৃদুহাস্য মনের কথা জানাইতেছিল, সেই হাসিটুকু মনে করুন। সব হইল, কিন্তু সে দুটী—সেই মনোহর গণ্ডদেশ দুটী কেমন লোহিত, কেমন শীতল, কেমন কোমল, যদি ধারণা করিতে না পারেন তবে বসন্তাগমে যে নবমুকুলিত কোমল চূতপত্রে মুখ দিয়া পিকবর বসিয়া আছে সেই চূতপত্রটী দেখিয়া আসুন।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা বলিতে পারেন সনাতন গোস্বামী এই বনের কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন।"

ইন্দু। আপনি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছেন? আপনার নাম কি?

কু। স্ত্রীলোকের নিকট আমাদের পরিচয় দেওয়া প্রথা নহে।

ইন্দু। প্রথা না থাকিতে পারে, কিন্তু অপরিচিতা রমণীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা, যুবকের এ কিরূপ প্রথা?

যু। নাম শুনিয়া লাভ কি বলুন?

ইন্দুমতি তখন হাসিয়া কহিল "লাভ আর কি! তবে এমন রূপের নাম কিরূপ শুনিতে ইচ্ছা হয়।"

কু। আমার নাম কুমার সিংহ। আমি কোন দূর দেশ হইতে আসিতেছি; আপনাদের তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

ইন্দু। এখন আপনি গোস্বামীর সন্ধান পাইতে পারেন; আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরাও সেইস্থানে যাইতেছি।

কুমার কোন কথা না বলিয়া রমণীদ্বয়ের অনুসরণ করিলেন। অগ্রে কনিষ্ঠা গজেন্দ্রগমনে পথ দেখাইয়া চলিলেন, মধ্যে জেষ্ঠা, পশ্চাতে কুমার তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

কুমারী চিন্তামগ্না। হৃদয়ে তাঁহার আশার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। মন যুবকের প্রশংসাবাদে ব্যস্ত হইয়া বলিল "আহা কি রূপ! কি সুমধুর নাম!"

অট্টালিকা সন্নিধানে আসিয়া ইন্দুমতি কুমারকে সনাতন গোস্বামীর মন্দির দেখাইয়া দিয়া উভয়েই অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রত্নমালা শূন্য মনে শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহে পূর্ব্ববৎ সকলই রহিয়াছে তথাপি কি যেন নাই, কে যেন তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। একবার মনে হইল "যদি আজ সরোবরে না যাইতাম, তবেত তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না।" আবার মনে হইল "তাঁহার সঙ্গে গেলাম না কেন?" পরক্ষণেই মনে হইল "তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলাম না কেন? আর কি তাঁহার দেখা পাইব?"

———০ঃঃ০———

দশম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

উপাসনা মন্দির।

"আজ্ঞা গুরূণাং হবিচারনীয়া।"

রঘুবংশ।

ইন্দুমতির নির্দ্দেশ মত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া কুমার দেখিলেন, গোস্বামী তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুমার বিনয়-নম্র-মস্তকে প্রণাম করিলে, গোস্বামী কহিলেন, "বৎস! তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশা করি রাজপুত-কুলতিলক হইয়া ব্রাহ্মণ কার্য্যে নিয়োজিত হও। তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

এই কথা বলিয়া কুমারকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। কুমার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

গো। কুমার! আমার নিকট কোন বিষয়ে আজ তোমাকে প্রতিশ্রুত হইতে হইবে। সম্মত আছ কি?

কুমার প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলিলেন "যাহা অনুমতি করিবেন, অবনত মস্তকে পালন করিব।"

গো। রাজপুত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কে কোথায় দেবকর্ম্ম সাধনার্থ ব্রাহ্মণ-বাক্য অবহেলন করে। তবে কিনা তুমি এখন বালক, যদি বিচলিত হও।

কু। যাহা অনুমতি করিবেন করুন; আপনার বাক্য শিরোধার্য্য।

গো। তবে বৎস! এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে কার্য্য

করিতে আদেশ করিব তাহা সাধিত হইবার পূর্ব্বে প্রণয়িণীর অঙ্গ স্পর্শ করিবে না। অঙ্গস্পর্শ দূরের কথা, চক্ষে দেখিলেও কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।

প্রতিজ্ঞা বাক্য শুনিয়া কুমার চমকিত হইলেন। হৃদয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল। মনোমধ্যে একটী প্রতিমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্দির মধ্যে কুমারের হৃদয় মন্দিরে এ কাহার প্রতিমূর্ত্তি? এ মূর্ত্তি কি কোন দেব দেবীর? যদি দেব দেবীর না হয়, তবে কাহার? তবে নিশ্চয়ই সেই প্রতিমার, সেই দেব-বাঞ্ছিত প্রেম-প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি! যে মূর্ত্তি আরাধনা করিবার হয়ত কুমারের আর অধিকার নাই।

কুমার নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মনে সে সময়ে যে, কি ভাবের উদয় হইতেছিল, যদি কেহ যথার্থ প্রেমিক থাকেন, প্রেম-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া প্রেমিক প্রেমিকার জন্য প্রণয় যে কি পদার্থ, যদি কেহ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তবে তিনিই তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিবেন।

কুমার মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন "প্রতিজ্ঞা করিলাম তাহাই করিব।"

গোস্বামী তখন গম্ভীর ভাবে কহিলেন "আমার আদেশ এই, অদূরে ঐ যে অট্টালিকা দেখিতেছ, উহার মধ্যে রত্নমালা নাম্নী একটী নিঃসহায়া রাজপুত দুহিতা বাস করে। তাহাকে মোগল সম্রাট আওরংজেবের পৈশাচিক প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা কর, এবং তাহাকে আশ্রয় দিয়া যে সত্ত্রামী হিন্দু সম্প্রদায় সম্রাটের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহায়তা কর।"

রত্নমালাকে কুমার যে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সে কথা গোপন করিয়া কহিলেন "রাজপুত দুহিতা রত্নমালা কে? আমি একা কিরূপে তাঁহাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিব?

গো। রত্নমালা যে কে, সে কথা পরে বলিব। তুমি একা নহে, সত্বরামীরা তোমার সহায়তা করিবেন। তুমি তাহাদের অধ্যক্ষ স্বরূপ থাকিবে। তুমি ভিন্ন কেহই রক্ষক হইতে পারিবে না।

কু। তাহাই হউক। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

গোস্বামী মন্দির মধ্য হইতে একখানি তরবারি বাহির করিয়া কুমারের হস্তে দিয়া বলিলেন "এই অসি, তোমার সহায় হইবে। এই অসি তোমার পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

কুমার অসি গ্রহণান্তে উৎসুক হইয়া কহিলেন "আমার পিতা কে? আমি ত কখন পিতৃপদ অবলোকন করি নাই। আমার পিতা মাতা কোথায়?"

গো। বৎস! উৎসুক হইও না। যে দিন আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, সেই দিন তুমি তোমার পিতা মাতার পরিচয় পাইবে। রাত্রি অধিক হইয়াছে, চল, রত্নমালার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়া দিয়া আসি। সম্রাট চর পাঠাইয়া যেরূপ সন্ধান লইতেছেন, তাহাতে রত্নমালাকে এক্ষণে চক্ষে চক্ষে রাখা আবশ্যক।

কুমার নীরবে গোস্বামীর অনুসরণ করিয়া রত্নমালার নিকটে চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

নিভৃত গৃহে।

"রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী॥"

গীতগোবিন্দ।

সরোবর হইতে আসিয়া অবধি রত্নমালা আজ অসুস্থা। বড় মাথা ধরিয়াছে। গাত্র জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। কে জানে রত্নমালার আজ কেমন কেমন যেন বোধ হইতেছে। আজ রাত্রে রত্নমালা আহার করিবেন না। সন্ধ্যা অতীত হইলেই যুবতী শয়ন কক্ষে যাইয়া দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলেন। এত সুকোমল, তবু যেন শয্যা আজ কণ্টকময়। আজ বড় গ্রীষ্ম। গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না।

রত্নমালার প্রাণ যেন হুহু করিতেছে, সেই নৈশ বায়ুর মত হুহু করিতেছে। হৃদয়ে কি যেন কি একটা প্রবেশ করিয়াছে। কৈ এত দিন ত ছিল না! আজ অকস্মাৎ এ মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল! যুবতীর হৃদয়ে একটী যুবকের মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে। এ মূর্ত্তি যে কুমারের! নতুবা এত সুন্দর দেখাইবে কেন! এখানে এ মূর্ত্তি কেমন করিয়া আসিল! বোধ হয় ভ্রম হইতেছে। যুবতী চক্ষুমর্দ্দন করিলেন, তথাপি সেই মূর্ত্তি! যেন কুমার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গবাক্ষ দিকে লক্ষ্য করিলেন সেখানেও কুমার দাঁড়াইয়া আছে॥

গৃহে কুমার, শয্যা পার্শ্বে কুমার, হৃদয় মধ্যে কুমার, অবশেষে দেখিলেন, জগৎ যেন কুমারময়।

পাঠক! যদি আপনি পাঠিকা হইতেন, তবে আপনার ঔৎসুক্য নিবারণ করিতাম। অথবা আপনি যদি বাস্তবিকই পাঠিকা হন, তবে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করি. কাণে কাণে বলুন দেখি, কখন কি প্রথম দর্শনে কোন অপরিচিত যুবককে প্রেমচক্ষে দেখিয়াছেন? কখন কি কোন যুবককে দর্শন মাত্রেই মনঃপ্রাণ হারাইয়াছেন? কখন কি তাঁহার প্রেমে মজিয়া ইহজীবনে কেবল তাঁহাকেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? কখন কি তাঁহার প্রশস্ত বক্ষে সংলগ্ন হইয়া আলিঙ্গন-জনিত অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে বাসনা করিয়াছেন? কখন কি ঈষৎ গোঁফ-রেখাযুক্ত ওষ্ঠে আপনার বিকম্পিত সুধাপূর্ণ বিম্বাধর স্থাপিত করিয়া প্রগাঢ় চুম্বনে জগৎ বিস্মৃত হইবার অভিলাষ করিয়াছেন? কিম্বা কখন কি আপনার শান্ত, স্থির, সরল কটাক্ষ তাঁহার বিস্ফারিত নেত্রে পাতিত করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তবে বলুন দেখি, সে যুবকমূর্ত্তি আপনার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে কি না? তাঁহাকে আবার দেখিতে বাসনা হয় কি না? বলুন দেখি, সেই বিমল মুখমণ্ডল হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া লইয়া গিয়া নির্জ্জনে বসিয়া সেই সাধের মুখখানি মানসচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা হয় কিনা? সেরূপ মুখের কিরূপ কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় কি না? আর তাঁহার নাম জানিলে সেই নাম নির্জ্জনে মধুর মুখে মিষ্টি করিয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে ভাল বাসেন কি না? যদি

করিয়া থাকেন, যদি দেখিয়া থাকেন, যদি বাসিয়া থাকেন, তবে আজিকার রাত্রে রত্নমালার মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন। তবে নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রী-সুলভ কোমল প্রাণ আজ একবার রত্নমালার দুঃখে দুঃখিত হইবে। কিন্তু পাঠক! আপনাকে রত্নমালার মনের কথা স্পষ্ট জানাইতে পারিলাম না। কেননা আমরাও পুরুষ। পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের মনের কথা কেমন করিয়া বলিব! তা যদি পারিতাম, তবে পুরুষের এ দুর্গতি কেন? পুরুষ জ্ঞানী হইল, বহুদর্শী নাম পাইল, কিন্তু কুহকিনী রমণীর প্রাণের কথাটী বুঝিতে পারিল না। পুরুষ যদি রমণী-হৃদয় চিনিতে পারিত তবে সংসারের সার পিতা মাতার হৃদয়ে যন্ত্রণা দিবে কেন? তবে কেন মণি অপেক্ষাও যে রত্ন মুল্যবান্, তুচ্ছ সুখ-সম্পদের জন্য তেমন প্রাণপ্রতিম ভ্রাতার সহিত দ্বন্দ্ব করিবে?

রত্নমালা শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলেন—"আ মরি মরি, কি মোহন রূপ! রূপের মাধুরীই বা কি! উহার স্পর্শসুখ কি কুসুম অপেক্ষা কোমল নয়? কি সুন্দর চক্ষু দুটী! পোড়ামুখী ইন্দুমতি মরে নাই কেন? নতুবা আর একবার দেখিতাম। কে বলে কন্দর্প বড় রূপবান্?—ছাই রূপবান্! অত রূপ আর হইতে হয় না! আর একবার ভাল করিয়া দেখিলাম না কেন? কেন তখন লজ্জায় মরিলাম? সাধ মিটিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিলাম না কেন? আহা! দর্শনে যদি এত সুখ, স্পর্শে না জানি কি সুখ আছে! না জানি কত কোমল, কত শীতল সেই সুকুমার দেহখানি! আ মরি মরি! কিবা সেই রাঙ্গা রাঙ্গা অধরোষ্ঠ! না জানি সে মুখচুম্বন কত মিষ্ট!" ক্রমেই চিন্তা

প্রগাঢ় হইল; তখন যেন আপন মনকে গোপন করিয়া চুপে চুপে ভাবিলেন "সেই স্পর্শসুখময় যুবকের হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া অধরে অধর চাপিয়া একসঙ্গে মিশিয়া যাওয়া—— সে কেমন !!"

এরূপ সময় কে যেন আহ্বান করিয়া বলিল "বৎসে রত্ন-মালে! তুমি কি ঘুমাইয়াছ?"

যুবতীর সুখের চিন্তা অন্তর্হিত হইল। চাহিয়া দেখিলেন, অগ্রে সনাতন গোস্বামী, পশ্চাতে সেই দেবদুর্লভ সুঠামমূর্ত্তি! যুবককে দেখিয়া রত্নমালার শরীর কণ্টকিত হইল। তখন আধ-আবরিত-বসনা, আধ-হাসি-ভরা-নয়না, আধ-লাজ-মাখা-বদনা, আধতনু আবরিত করিয়া আধস্বরে বলিলেন "না পিতা, ঘুমাই নাই।"

বদন আপনা আপনি অবনত হইল। গোস্বামী কহি-লেন "মা, লজ্জা করিতে হইবে না, যাহা বলি মন দিয়া শুন। বোধ হয় ইন্দুমতির মুখে শুনিয়া থাকিবে, কোন রাজপুত কুমারের হস্তে তোমার রক্ষা ভার অর্পণ করিতে মানস করি-য়াছি। যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনিই সেই রাজপুত কুমার; নাম কুমার সিংহ। ইনি তোমার রক্ষাভার লইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আজ হইতে ইনি আপদে বিপদে তোমার সহায় হইলেন। তুমিও সাধ্যমত ইঁহাকে যত্ন করিবে।"

রত্নমালার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি কোনও কথা কহিলেন না।

সনাতন গোস্বামী কহিলেন "কেমন সম্মত আছ কি?"

রত্নমালা বামদিকে ঈষৎ বঙ্কিমভাবে মস্তক নত করিলেন।

সম্মতি-লক্ষণ জানিয়া গোস্বামী কহিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে, ইন্দুমতিকে বলিয়া দাও, তোমার পার্শ্ববর্ত্তী এক কক্ষে কুমারের শয্যা রচনা করিয়া দেয়; আহারাদি হইয়াছে, তজ্জন্য কোনও উদ্যোগের প্রয়োজন নাই। আমি এখন চলিলাম।"

গোস্বামী চলিয়া গেলে, রত্নমালা পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ভাবিলেন "কুমারকে বসিতে বলি, তাহাতে দোষ কি?' আবার ভাবিলেন "ওমা ছি ছি, তাও কি হয়! সে কি কথা, আমি যে যুবতী, আমার কাছে যুবক বসিবে কি!"

তখন রত্নমালার জ্ঞান হইল, যুবকের কাছে যুবতীর এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও অনুচিত। অমনি আস্তে আস্তে সরিয়া, আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া ইন্দুমতিকে আস্তে আস্তে সকল কথা বলিলেন। ইন্দুমতি অন্যগৃহে শয্যা রচনা করিয়া সাদর-সম্ভাষণে কুমারকে তথায় লইয়া গেল। কুমার শয়নে পদ্মনাভকে স্মরণ করিলেন।

———o॰॰o———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—o॰॰o—

বঙ্গে উপদ্রব।

"Let once my army-leader Lannes
Waver at yonder——————"

ROBERT BROWNING.

কুমার রত্নমালার রক্ষাভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে

একদা সম্রাট্ আওরংজেব দিল্লীর সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পারিষদবর্গ বসিয়া আছেন। এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া কহিল,—

"খোদাবন্দ! বঙ্গদেশ হইতে একজন দূত আসিয়া দ্বারে দিল্লীশ্বরের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে।"

সম্রাট কহিলেন "আসিতে দাও।"

প্রতিহারী দূতকে সংবাদ দিল। দূত আসিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল "দিল্লীশ্বর! একবার স্বচক্ষে বঙ্গের দুর্দ্দশা দেখিয়া আসুন। দিনে দিনে মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে বঙ্গদেশ ধ্বংশ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তাহারা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। প্রজাদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন, পথিকের ও নৌকারোহীদের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব আর থাকে না। তাহাতে অনেকের প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইতেছে। অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া বঙ্গদেশে শান্তি-স্থাপন করুন।"

দূত এই কথা বলিয়াই নীরব হইল।

মীরজুম্লা সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ও সদ্বিবেচক। তিনি সম্রাটের পার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলেন। দূত নীরব হইলে সম্রাট তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"তবে অনতিবিলম্বে বঙ্গদেশে সৈন্য প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কাহার হস্তে সৈন্য প্রেরণ করিলে ভাল হয়?

মীর। দিল্লীশ্বর যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন।

সম্রা। আমার বিবেচনায় নাহুরখাঁকে পাঠানই কর্ত্তব্য, কারণ নাহুরখাঁ সাহসী ও বীরপুরুষ এবং কয়েকবার বঙ্গে

যাতায়াত করিয়াছে। বঙ্গের অবস্থাও উহার বেশ জানা আছে। কিন্তু, তাহা হইলে কাফের সত্তরামীদের সহিত যুদ্ধে কিছুদিনের জন্য নিরস্ত থাকিতে হইবে; কারণ নাহুরখাঁ ব্যতীত কৌশলে রত্নমালাকে হস্তগত করা সুকঠিন হইবে।

নাহুরখাঁ অর্থাৎ মুকুন্দদাস সম্রাটের প্রায় সন্নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি যবনের মুখ হইতে এইরূপ ভাবে রত্নমালার পবিত্র নাম শুনিয়া দন্তে জিহ্বা কাটিলেন এবং মনে মনে কহিলেন,—

"যদি কখন যবন সম্রাটের রক্তে হস্তকে ধৌত করিয়া যশোবন্তের সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকে নির্ব্বাপিত করিতে পারি, সেই দিন—সেই দিন ইহার প্রতিশোধ লইব।"

সম্রাট্ নাহুরখাঁকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলে তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাট্ কহিলেন,—

"নাহুরখাঁ! আমার বিবেচনায়, তুমিই মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রব শান্তির জন্য বঙ্গদেশে গেলে ভাল হয়। তুমি যত দিন না ফিরিয়া আসিবে, তত দিন সত্তরামীদের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিব।

নাহু। দিল্লীশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য।

সম্রা। তবে কল্য প্রভাতেই তুমি সসৈন্যে বঙ্গে যাত্রা করিবে। সাবধান, অন্যথা না হয়।

নাহুরখাঁ মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া কহিলেন,"আজ্ঞা।"

সম্রাট্ আদেশ দিয়া বিশ্রাম গৃহে চলিলেন। তৎপরে সকলেই একে একে উঠিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সম্রাটের মুখে নাহুরখাঁর প্রশংসাবাদ শুনিয়া অনেকেই

ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা বিরুদ্ধাচরণের পরামর্শ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

"বঙ্গদেশে যাইতে হইবে!" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মুকুন্দদাস নিজ আবাসে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কতই চিন্তা হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—

"আহা, বঙ্গের দৃশ্যটী কি মনোহর! মনে হইলেই অপার আনন্দ উপস্থিত হয়। একি! সহসা স্মৃতিপথে কে এ অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কিবা প্রীতি প্রফুল্ল সুবিমল শশাঙ্ক গর্ব্বিত মুখমণ্ডল! কিবা সুচঞ্চল ঢল ঢল আয়ত নয়ন যুগল! বিধুমুখে কি মধুর, মধুর-হাসি! ওহো চিনিয়াছি—তুমি? তুমি আমার সেই তপেস-তনয়া! অসীম যত্ন, অদ্ভুত মমতা, অপার ভালবাসা যাহার, সেই তুমি, চিনিয়াছি তুমি আমার সেই তপেস তনয়া! বঙ্গে যাইয়া আর কি তোমার সাক্ষাৎ পাইব? অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে হয়ত এতদিন সে আমার—আমার সে ফলবতী হইত। যদি যৌবন পীড়নে—না, না, তাহাও কি সম্ভব হয়! কিন্তু—কিন্তু রমণী-হৃদয় জলধির ন্যায় তরঙ্গিত, তাহাকে বিশ্বাস কি? না না সে আমার তেমন নয়। জলধি যেরূপ পূর্ণ কলানিধিকে দেখিলে আহ্লাদে হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে, আমোদে অধীর হইয়া ধরিতে যায়, হৃদয়-চাঁদকে দেখিলে পতিব্রতা রমণী-হৃদয়ও সেইরূপ উথলিয়া উঠে। উঃ আমি কি নিষ্ঠুর! আমার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০ৃ৹০—

তবে আসি।

"But eager love denies the least delay."
POPE'S ILIAD.

"Oh had I the wings of a dove,
How soon would I taste you again
My sorrows I then might assuage"—
COWPER.

যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং যে যাহাকে ভাল বাসে এরূপ স্থলে সে তাহাকে একবার না দেখিলে বাঁচে না। মুকুন্দ কুমারকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসেন। তিনি কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে বনভূমিতে চলিলেন।

সহরামীরা প্রায় সকলেই জানিতেন যে, যদিও মুকুন্দদাস সম্রাটের কর্ম্মচারী তিনি কখনই তাঁহাদের অনিষ্ট করিবেন না। তিনি প্রায়ই কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন কেহ তাহাতে বিরক্ত হইতেন না।

বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া তিনি কুমারের সাক্ষাৎ পাইলেন, নিকটে বসিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন,—

"কুমার! সম্রাটের অনুমতি, কল্য আমাকে মাহ্‌ ্ট্রীয়দের উপদ্রব শান্তির জন্য বঙ্গদেশে যাইতে হইবে। সেই জন্য তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।

এতদিন পরে মকুন্দের মুখে বঙ্গদেশের নাম শুনিয়া কুমারের

কর্ণকুহর শীতল হইল। মনে একবারে নানারূপ ভাবের উদয় হইল। বঙ্গদেশের সমস্ত চিত্র আসিয়া তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সেই চারুগ্রামের চারুদৃশ্য! সেই দ্বারকেশ্বরের কুল কুল ধ্বনি! সেই বাল্যাবস্থার আশ্রয় স্থান, গ্রাম্য বালক বালিকা, নানা রূপ প্রকৃতির শোভা, জগচ্চন্দ্রের পরিবার বর্গ, সকলই মনে পড়িল। আর মনে পড়িল সেই প্রেম-প্রতিমার সেই মুখখানি। যে মুখ আজ প্রায় দুই বৎসর হইল দেখেন নাই, বিদায় কালে যাহার বিমর্ষভাব সময়ে সময়ে, এখনও হৃদয়ে অস্তিত্ব রূপে যাতনা প্রদান করে, সেই মুখখানি, হৃদয় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মনে যাতনা হইতেছিল, অবশেষে উত্তর করিলেন,—

"কি বলিলেন, বঙ্গদেশে যাইবেন?"

মুকু। সম্রাটের অনুমতি, না গেলে চলিবে না। ইচ্ছা ছিল তোমাকেও লইয়া যাইব কিন্তু তুমি কি সম্মত হইবে?

বঙ্গদেশ যাইবার জন্য কুমারের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তখনই ভাবিলেন "না, তাহা হইবে না। তাহা হইলে রত্নমালার রক্ষা ভার কে গ্রহণ করিবে? ব্রাহ্মণের বাক্য অবহেলা করিলে রাজপুত নামে কলঙ্ক হইবে।"

কুমারের মুখ মলিন হইল, কহিলেন "না আমার যাওয়া হইবে না। কিন্তু যদি—।"

মুকু। কি বল না? "কিন্তু যদি" বলিয়া থামিলে কেন?

কু। কিছু নয়, বলিতেছিলাম যদি কল্যই যাওয়া হয়, তবে আপনি আবার কতদিনে প্রত্যাগমন করিবেন?

মুকু। বিদ্রোহের শান্তি করিয়া ফিরিব।

তখন কুমারের মনে হইল, "আমিও যাই, আবার না হয় ফিরিয়া আসিব, কিন্তু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘণ হইবে। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘণ মহাপাপ। নরকে যাইতে হইবে, নরকের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তাহাও না হয় করিব, তবুত একবার—একবার সেই মুখখানি দেখিতে পাইব।" আবার তখনই ভাবিলেন "না আমার যাওয়া হইবে না!" কহিলেন, "রাত্রি অধিক হইতেছে, চলুন আপনার সহিত বনভূমির পার পর্য্যন্ত যাই।"

উভয়েই অশ্বে আরোহণ করিয়া, নানারূপ কথা কহিতে কহিতে বনের বাহিরে আসিতে লাগিলেন। দুই জনে সুখ দুঃখের অনেক কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু "মুকুন্দ! তুমি বঙ্গে যাই-তেছ। চারুগ্রামে যাইয়া একবার চন্দ্রলেখাকে দেখিয়া আসিও" এই প্রাণের কথাটী প্রাণেই রহিল। মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না। মুকুন্দও চুপে চুপে মনে মনে ভাবি-লেন "যাইতেছি বটে কিন্তু আর কি সেই সুখময়ী মোহিনী মূর্ত্তির দর্শনলাভ এ ভাগ্যে ঘটিবে?

মুকুন্দ বনভূমি অতিক্রম করিয়া কহিলেন "আর না, তুমি যাও, আমি আসি।"

কুমার তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া [illegible]নাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই উদ্ভ্রান্তচেতা উভয় যুবকের চিত্ত চিত্রিত করিতে হইলে কি দেখিব? দেখিব, নবোঢ়া ষোড়শী প্রেয়সীর বিরহে যুবক মাত্রেরই চিত্ত যেরূপ কেমন একরূপ উড়ু উড়ু, ইহা-

দেরও সেইরূপ। উভয়েই বোধ হয় ভাবিতেছেন "যদি আমার পাখা থাকিত!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দৈব দুর্ব্বিপাক।

"কে তুমি? কি হেতু ঘোর নিশাকালে হেথা?
কহ শীঘ্র করি, বাঁচিতে বাসনা যদি!
নতুবা মারিব———"

মেঘনাদ বধ।

কুমার প্রত্যাগমনকালে কতক দূর আসিয়া বিদ্যুতালোকে দেখিলেন, দুইজন সশস্ত্র অশ্বারোহী বনভূমির বহির্দ্দেশ অভিমুখে আসিতেছে। একবার অন্ধকার হইল আবার বিদ্যুৎ চমকিল। এবার দেখিয়া কুমার মোগল সৈন্য বলিয়া চিনিলেন। তাহাদিগকে যোদ্ধৃবেশে আসিতে দেখিয়া যুবকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভাবিলেন "ইহারা কি অভিপ্রায়ে বনভূমিতে আসিয়াছিল! ইহারা কি সম্রাটের চর? মুকুন্দের অন্বেষণে আসিয়াছিল? অথবা সন্ন্যাসীদের গুপ্ত বিষয় জানিবার জন্য আসিয়াছিল? তবেত রত্নমালা—স্নেহের রত্নমালা তবেত পাষণ্ডদের হস্তে বিনষ্ট হইয়া থাকিবে!"

অকস্মাৎ ধমনীতে রাজপুতরক্ত প্রবাহিত হইল। বদন-মণ্ডল রক্তিম হইল। তাহার পর বিদ্যুতালোকে দেখিলেন, একজনের উষ্ণীষে একখণ্ড প্রস্তর জ্বলিতেছে। বুঝিলেন সম্রাটের কোন সেনাপতি হইবে। যিনিই হউন ক্রোধ-কম্পিত-কলেবর হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন "কে তোমরা বন-স্বামীর বিনা অনুমতিতে বনে প্রবেশ করিয়াছ? যে কেহ হও অস্ত্র ধর, দুরভিসন্ধির প্রতিফল গ্রহণ কর।"

এই কথা বলিয়া যুবক কোষ হইতে অসি নিষ্ক্রান্ত করিলেন এবং সিংহশাবক যেরূপ উন্মত্ত করীর উপর পতিত হয় সেই-রূপ যবনদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন। এক আঘাতেই একজন ধরাশায়ী হইল। অপর জন পতনোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি একবার মাত্র চাহিয়াই নিজ অসিতে যুবকের অসি ব্যর্থ করিল। অস্পষ্টতা নিবন্ধন কেহ কাহাকেও ভালরূপ দেখিতে পাইলেন না। উষ্ণীষধারী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি দৃঢ়কটাক্ষ করিয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। তাহাতে যুবকের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল। কিন্তু যবনের সুদৃঢ় বর্ম্মে লাগিয়া তাঁহার সকল অস্ত্রাঘাতই বিফল হইল।

তখন উষ্ণীষধারী বীরদর্পে কহিলেন, "রাজপুত! ক্ষান্ত হও। এতক্ষণ যে বর্ম্মবিহীন কলেবরে আমার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়াছ, সেজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি তুমি আমাকে চিন নাই কিন্তু আমি তোমাকে চিনিয়াছি। ইচ্ছা করিলে মীরজুম্লা অক্লেশে তোমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে কিন্তু তোমার বীরত্বকে ক্ষমা করিলাম।"

যুবক আপনাকে বর্ম্মহীন বিবেচনা করিয়া নিরস্ত

হইলেন। উভয়েই কোষে অসি সংস্থাপিত করিয়া স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যে সময়ে সম্রাট মুকুন্দের নানারূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বঙ্গের বিদ্রোহ-শান্তির জন্য অনুমতি প্রদান করেন, মীরজুম্লা তখন ঈষৎ বিরক্তভাব দেখাইয়াছিলেন। কুমারের সহিত মুকুন্দ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এ সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন। বিপক্ষ কুমারের সহিত মুকুন্দদাসের বন্ধুত্ব বিষয়ে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,সেইজন্য তিনি অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। বিফলপ্রযত্ন হইয়া তাই প্রত্যাগমন করিতেছিলেন।

মুকুন্দের অনুসন্ধান হইল না। মীরজুম্লার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। কেবলমাত্র নির্দ্দোষী সৈনিকের পতন হইল। কালের নিয়মই এই।

এতক্ষণ গগন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বায়ুবেগে মেঘ চালিত হইলে আকাশ পরিস্কার হইল। আকাশে নক্ষত্র পুঞ্জ দেখা দিল। সপ্তমীর চন্দ্র উদিত হইল।

কুমার যে সময় মুকুন্দের সঙ্গে বহির্দ্দেশে গমন করেন তখন রত্নমালা আপন কক্ষে জাগিয়াছিলেন। "এত রাত্রি হইল তবুও কুমার ফিরিলেন না কেন" এইরূপ মনে হওয়ায় রত্নমালা ছাদের উপর আসিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। কতক্ষণপরে পাণ্ডুবর্ণ বদনে রক্তাক্ত কলেবরে কুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রত্নমালা আহ্লাদিতা হইয়া নিকটে

আসিলেন। পরে সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত এবং ক্ষতস্থান হইতে রুধির ধারা বিনির্গত হইতেছে দেখিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে কুমার! গাত্রে রক্ত কেন?"

শরীর এত অবসন্ন হইয়াছিল যে, তিনি সবিশেষ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল কহিলেন "শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়াছে, শয়ন করিব।"

রত্নমালা তাঁহাকে ছাদে লইয়া গেলেন। তথায় শয়ন করাইয়া শীতল জলে বদন ধৌত করিয়া দিলেন এবং তালবৃন্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে গাত্রের রক্ত ধৌত করিয়া নিজ অঞ্চল দিয়া জল মুছিয়া দিলেন। ইন্দুমতি নিজকক্ষে নিদ্রিতা ছিল; ব্যস্ততা নিবন্ধন রত্নমালা তাহাকে জাগাইতে অবসর পাইলেন না।

রত্নমালা ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছেন। কুমার কাতর স্বরে কহিলেন "রত্নমালে! তোমার উপকার কখনই ভুলিতে পারিব না। জগতে এমন কি আছে, যাহাতে তোমার প্রত্যুপকার করিব।"

রত্নমালা প্রত্যুপকারের কথা শুনিয়া লজ্জিতা হইলেন। কোন উত্তর না দিয়া মনে মনে কহিলেন "তুমি আমার আর কি উপকার করিবে। ঈশ্বর করুন, যেন চিরদিন তোমার পদসেবা করিতে পাই, তাহা হইলেই আমি উপকৃত হইব।"

তাহার পর রত্নমালা সিক্ত পরিচ্ছদ খুলিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলেন। কুমার অবসন্নতা হেতু ছাদের উপরেই শয়ন করিলেন; রত্নমালাকে আপন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিতে কহিলেন।

রত্নমালা কহিলেন "তোমাকে কিছু সুস্থ না দেখিয়া আমি যাইব না।"

কুমার অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলেন। রত্নমালা তাঁহার মস্তক উপাধান হইতে পতিত দেখিয়া আপন উরুদেশে স্থাপন করিলেন এবং তালবৃন্ত দ্বারা পূর্ব্বমত ব্যজন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

"Oh that a dream so sweet, so long enjoyed,
Should be so sadly, cruelly destroyed——"

MOORE.

রত্নমালার প্রশস্ত উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ছাদের উপর চন্দ্রের ক্ষীণালোকে কুমার অগাধ নিদ্রায় নিদ্রিত। রত্নমালা তালবৃন্ত হস্তে ব্যজন-তৎপরা। আর নিমেষশূন্য নয়নে সেই জ্যোতিঃপূর্ণ বদনমণ্ডল অবলোকন করিতেছেন, যেন আয়ত লোচনদ্বয় পিপাসিত হইয়া যুবকের অধরসুধা পান করিতেছে। নিদ্রিতাবস্থায় যুবকের মুখমণ্ডল ক্ষণকাল বিমর্ষভাবে থাকিয়া একবার হাসিয়া উঠিল, আবার চমকিত হইল।

রত্নমালা স্থিরদৃষ্টে সেই সকল ভাব দেখিতেছেন আর আপন মনোমত করিয়া সেই সকল ভাবের অর্থ করিতেছেন। মনে মনে বলিতেছেন,—

"কুমার! তুমি বিমর্ষ হইতেছ কেন? তোমাকে বিমর্ষ দেখিলে মনে যাতনা হয়। তোমার কিসের অভাব আমাকে বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব। আমার যাহা কিছু আছে তাহা তোমার। প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত নহি। তোমার জন্য প্রাণ যে কি করে,দেখাইবার হইলে দেখাইতাম। তুমি কি আমাকে ভালবাস? যে হাত দুটী কণ্ঠে ধারণ করিতে আমি এত উৎকণ্ঠিত, সে কি তোমার এই হাত!"

এইরূপ বলিতে বলিতে রত্নমালা কুমারের দক্ষিণ হস্ত আপনার উত্তপ্ত বক্ষে ধারণ করিলেন। আবার মনে মনে কহিলেন,—

"কতবার মনে করি তোমাকে তোমার প্রাণের কথা সুধাই, কিন্তু পাছে তুমি কিছু মনে কর, সেইজন্য কোন কথা বলিতে পারি না। পাপ লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়। একবার হাস না কুমার! তোমার হাসিভরা মুখ আমায় বড় ভাল লাগে।"

রত্নমালা দেখিলেন, কুমার সত্য সত্যই হাসিতেছেন। হয়ত রত্নমালার মনের কথা শুনিতে পাইয়া তাহার কথা রাখিবার জন্য হাসিতেছেন। রত্নমালার আনন্দ আর ধরিল না। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। সে অশ্রুবিন্দু যে কুমারের গণ্ডদেশে পতিত হইয়া তাঁহার বদনমণ্ডল সিক্ত করিতেছে তাহা দেখিতে পাইলেন না। আবার মনে মনে কহিলেন,—

"আর একবার হাস! চমকিয়া উঠিলে কেন? আমিত নিকটেই আছি! যন্ত্রণা হইতেছে? গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছি! এখনি যন্ত্রণার উপশম হইবে!"

রত্নমালা গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ দেখিলেন, তাঁহার উন্নত বক্ষোপরি যুবকের কর সন্নিবেশিত। বক্ষে কেমন করিয়া হস্ত আসিল? রত্নমালা কেমন করিয়া জানিবেন! প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। শরীর কণ্টকিত হইল। ধীরে ধীরে হস্তটী নামাইয়া যথাস্থানে রাখিলেন, আবার তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখনও হৃদয়ে আবেগ স্রোত বহিতেছিল, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়া তখন কুমারের গণ্ডস্থল ভাসাইতেছিল।

পাঠক! রত্নমালা যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন সত্যই কি কুমারের মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়া তাঁহাকে কখন বিষণ্ন কখন হাস্যযুক্ত কখন বা চমকিত করিতেছিল?—না তা নয়। তবে নিশ্চয়ই কুমার কোন স্বপ্ন দেখিতেছেন। এরূপ কষ্টের সময়ে তাঁহার হৃদয়-নদীতে কি স্বপ্ন প্রবাহিত হইতেছে? স্বপ্ন কি সুখের না দুঃখের? এ স্বপ্ন সুখেরও নয় দুঃখেরও নয়, তবে সুখ দুঃখ মিশ্রিত বটে।

দেখিতেছেন—প্রাণের চন্দ্রলেখা যেন দিল্লীতে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে; এখনও যেন তাহার বিবাহ হয় নাই। আসিয়া কোন কথা না বলিয়া যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যেন কুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে কেন?"

সেই কথা শুনিয়াই চন্দ্রলেখা যেন বলিতেছে,—

"কুমার তুমি এত নির্দ্দয় কেন? ভুলেও কি কখন আমার নাম মুখে আনিতে? আবার আসিব বলিয়া আশা দিয়া কেন আর দেখা দিলে না? তুমি পুরুষ, তুমি না হয় সব সহ্য করিতে পার। তুমি না হয় সব ভুলিয়া থাকিতে পার। তোমার অনেক উচ্চাভিলাষ আছে, নানা দেশ জয় করিয়া যোদ্ধা নামে পরিচিত হইবার বাসনা আছে। ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ধনী হইবার ইচ্ছা আছে। যশের কার্য্য করিয়া জগতে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনা করিবার কামনা আছে। সুতরাং ভালবাসা, প্রণয়, তোমার নিকট তুচ্ছ হইতে পারে। আর বিচ্ছেদ যাতনা যদি ততই যন্ত্রণাদায়ক হয়, তবে এমন সুন্দর স্থানে থাকিয়া তাহাও অক্লেশে ভুলিতে পার। কিন্তু বল দেখি, আমার মত বালিকার পক্ষে, যাহার তুমিই একমাত্র সহায়, সে কি উপায়ে বাঁচিবে? অন্তঃকরণই যাহার রাজ্য, ভালবাসাই যাহার ধন সম্পত্তি, পবিত্র প্রণয়ই যাহার উচ্চাভিলাষ, আর তুমিই যাহার কীর্ত্তিস্তম্ভ, সে কিরূপে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিবে? ক্রন্দন ভিন্ন যাহার আর অন্য উপায় নাই, সে কতদিন এমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে?"

চন্দ্রলেখা যেন এই সকল কথা বলিতেছে, আর কুমার দাঁড়াইয়া সেই সকল কথা শুনিতেছেন। সেইজন্য নিদ্রিতাবস্থায় কুমারের মুখ বিষন্ন ভাব ধারণ করিল।

আবার কতক্ষণ পরে দেখিতেছেন—যেন ক্রোধের উপশম হওয়ায় চন্দ্রলেখা এখন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাঁহাকে আহ্লাদিত করিবার জন্য সান্ত্বনা বাক্যে যেন বলিতেছে,—

"এত কথা বলিলাম বলিয়া দুঃখ করিও না। অনেক দুঃখ

পাইয়াই বলিয়াছি, তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে বলিব—কে সহ্য করিবে ?”

কুমার যেন অপ্রতিভ হইলেন। এতদিনের পরে প্রাণের প্রতিমাকে পাইয়াছেন ; বক্ষে রাখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। মুখে আর হাসি ধরে না। সেইজন্য নিদ্রিতাবস্থায় কুমারের মুখ সহসা হাস্যযুক্ত হইল।

তখন চন্দ্রলেখা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সোহাগে গলিয়া যেন কুমারের বাহুযুগল মধ্যে প্রবেশ করিল। বক্ষোদেশে হৃদয় ও স্কন্ধদেশে মস্তক রাখিয়া বালিকা দরবিগলিত ধারায় যেন আনন্দাশ্রু ফেলিতে লাগিল। কুমার আনন্দাশ্রুসিক্ত অধর, গাঢ় চুম্বনে আবরিত করিলেন। চন্দ্রলেখার অশ্রুজলে কুমারের গণ্ডদেশ সিক্ত হইল। এরূপ সময়ে যেন একজন শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধব্রাহ্মণ পশ্চাদ্দেশে আসিয়া বলিলেন, “একি কুমার! এই কি তোমার—”

কুমার ভীত ও চমকিত হইয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না, অমনি তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। স্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন “চন্দ্রলেখা !—কই ?”

কুমার জাগিয়া উঠিলেন।

ছিছি——ছি বিধাতঃ! তোমার একি কায! তুমিও কি কাহারও সুখ দেখিতে পার না? যাহার সুখের অন্য আশা নাই, যে জন ইহ জীবনে সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতি একি ব্যবহার! প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রণয়িনীর বদন যে কত সুন্দর, বিধাতা হইয়া তুমি কি তাহা জান

না? ইহ জীবনে সেই মুখটী আর একবার দেখিবার আশা যাহার ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষণিক স্বপ্নজনিত তেমন সুখে কেন বাদী হও? তাও কি অন্য সময়! যখন সেজন অনির্ব্বচনীয় সুখের অগণিতধারা পান করিতেছিল! তখন—সেই সুখের সময় তুমি তাহাতে বাধা দিলে কেন? তেমন সুখভোগ করিতে দেওয়া যদি তোমার উদ্দেশ্য ছিল না, তবে তাহাকে তেমন স্বপ্ন কেন দেখাইলে? আর যদিই দেখাইলে,তবেতেমন সময় তেমন স্বপ্ন হইতেকেন তাহাকে জাগরিত করিলে? মহানিদ্রার অনন্তস্রোতে ফেলিয়া দিলে কে তোমায় দোষ দিত?

কুমার জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া কাহার অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে। চাহিয়া দেখিলেন রত্নমালা শীর্ষদেশে বসিয়া কাঁদিতেছে। তখন মনে মনে রত্নমালার গুণগান করিয়া কহিলেন "একি রত্নমালা তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি সুস্থ হইয়াছি; যতদিন বাঁচিব তোমার স্নেহ মনে রাখিব। আমার জন্য কাঁদিও না। যাও এখন রাত্রি আছে শয়ন করগে। আমিও চলিলাম।"

কুমার আপনার শয়ন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন—শয়ন করিলেন বটে কিন্তু আর নিদ্রা আসিল না। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মনে বড়ই কষ্ট হইল। আবার একটী তেমনি ভাবের স্বপ্ন দেখিবার বাসনা হইল; কিন্তু আর নিদ্রা আসিল না, স্বপ্ন আর দেখা দিল না।

রত্নমালাও দুঃখিত অন্তঃকরণে আপন শয্যায় শয়ন করিলেন। আকুল প্রাণে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। প্রাণের আশা ভরসা যেন নৈরাশ্যতপনের অসহ্য তাপে শুকাইয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রলেখা কে?

"————বলিত সে বারংবার,
সে আমার আমি তার অন্য কা'র হ'ব না।"
হেমচন্দ্র।

কুমার আরোগ্য-লাভ করিয়া একদিন নিদাঘ দিবসান্তে ছাদের উপর মন্দমন্দ পদচারণা করিতেছেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ হইয়া পশ্চিমদিক্ লোহিতাভায় শোভিত করিতেছিলেন। মৃদু মন্দ সমীরণ বিবিধ বনপুষ্পের সৌরভ হরণ করিয়া যুবককে উপহার দিতেছিল। একটী ভ্রমর যুবকের কাণের কাছে ভোঁ ভোঁ শব্দে কি বলিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া নিকটস্থ বৃক্ষে লুকাইল। যুবক কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একই ভাবে আপন মনে বেড়াইতে লাগিলেন।

একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। আবার চারিদিক অবলোকন করিতেছিলেন। যুবক কি প্রকৃতির শোভা দেখিতেছেন? না, আজ তিনি প্রকৃতির শোভা অথবা তেমন কোন নয়নতৃপ্তিকর পদার্থের দিকে দৃষ্টি-পাত করেন নাই। তিনি চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া যেন সুখ দুঃখ মিশ্রিত কি একটী স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। চক্ষু দুটী একবার ছল ছল, ঢল ঢল, টল্ টল করিতে করিতে টস্ টস্ করিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিল। যুবক তাহা মোচন করিলেন।

এমন সময়ে রত্নমালা নিকটে আসিয়া কহিলেন "কুমার! আজ তোমাকে এরূপ দেখাইতেছে কেন?"

কু। কিরূপ দেখাইতেছে?

রত্ন। কেমন কেমন যেন বোধ হইতেছে—যেন তুমি কাঁদিতেছিলে!

কু। কৈ না, কাঁদিব কেন?

রত্ন। আমার কাছে গোপন কেন? কি হইয়াছে? আমি তোমাকে এরূপ ভাবে আরও একদিন দেখিয়াছিলাম। তুমি এরূপ ম্লান মুখে কি ভাব?

কু। কি আর ভাবিব, কিছু না।

রত্ন। না না নিশ্চয়ই তুমি কি চিন্তা কর, না বলিলে আর কখন আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।

কু। আমার চিন্তার বিষয় তোমার নিকট বক্তব্য নয়।

রত্ন। কেন আমাকে কি তুমি পর বিবেচনা কর? আমি কি কাহাকেও বলিয়া দিব, সেই আশঙ্কায় বলিবে না?

কু। সে কথা কাহার নিকট বলিবার নয়।

রত্ন। আচ্ছা সে কথা নাই বল, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার ঠিক্ উত্তর দিবে?

কু। তা অবশ্য দিব।

রত্নমালা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "সে দিন যখন তুমি আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইতেছিলে, তখন 'চন্দ্রলেখা' বলিয়া যে জাগিয়া উঠিলে সে "চন্দ্রলেখা" কে?

কুমার রত্নমালার মুখে সহসা চন্দ্রলেখার নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। কহিলেন "ঘুমের ঘোরে কি বলিয়াছি তা কি

স্মরণ আছে! কি বলিলে? চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা কে? কই আমিত কিছুই জানি না।

রত্ন। ছি, ছি কুমার! আমাকে মনের কথা বলিতে শঙ্কিত হইতেছ? মনেও ভাবিও না, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হইবে। সত্য বলিতেছ, জান না?

কু। না, রত্নমালা! তোমার কাছে কখন কোন কথা গোপন করি নাই। আজও করিব না। তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সে চন্দ্রলেখা কোন বালিকা। এতদিন হয়ত কোন ভাগ্যবানের জীবনসর্ব্বস্ব। আর কিছু জানি না।

রত্ন। যদি অন্য কোন ভাগ্যবানের জীবনসর্ব্বস্ব, তবে তুমি তাহার নাম মুখে আনিলে কেন?

কু। আমি তাহাদের বাড়ীতে থাকিতাম, তাই সে আমাকে ভাল বাসিত, আমিও তাহাকে স্নেহ করিতাম; সেই জন্য সময়ে সময়ে মনে পড়ে।

রত্ন। মনে পড়িতে পারে কিন্তু তাহার জন্য কাঁদ কেন।

কু। লজ্জা করিয়া কি করিব, বলি শুন। আমি বাল্য-কাল হইতে তাহাকে ভালবাসিয়াছি। প্রথমতঃ ভাই যেমন ভগ্নীকে ভালবাসে তাহা ভিন্ন অন্য রূপ জানি-তাম না। স্নেহের ভগিনী যেমন নিকটে আসে, কাছে বসে, তেমনি চন্দ্রলেখাও আমার নিকট আসিত, বসিত, কথা কহিত; কিন্তু রত্নমালা! কে জানিত যে, সে ভালবাসার বীজ ভিন্ন জাতীয়; সে বীজ হইতে যে প্রণয়াঙ্কুর বহির্গত হইবে তাহাই বা কে জানিত? তাহার পর চন্দ্র-লেখাও আমাকে অন্য চক্ষে দেখিতে শিখিল। ভাবিতাম,—

সে কি আমার হবে?" ভুলিয়াও ভাবিতাম না, যাহার জন্য কতজন রত্ন লইয়া বসিয়া আছে, সে রত্ন দীন হীন অনাথের পক্ষে একান্ত দুর্লভ। তখন ভাবিতাম না যে, সে কুসুম মরুভূমিতে ফুটিতে পারে না। কিন্তু রত্নমালা! সে যে কেমন কুসুম বলিতে পারি না। সেই একটু একটু লাজমাখা একটু একটু হাসিভরা মুখখানিতে যেন জানাইত, সে মরু ভূমিতেই ফুটিতে বাসনা করে।

কুমার বলিতে বলিতে নীরব হইলেন।

রত্নমালা কহিলেন "তাহার পর?"

কু। তাহার পর আর কি বলিব! তত যে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়! কতই যে তাহার ভালবাসা!—তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণটী ভাল বাসিবার জন্য কতই যে হাবুডুবু খাইত, কে তাহার মর্ম্ম বুঝিবে! আমাকে দেখিলেই চন্দ্রলেখার গণ্ডস্থল রক্তিম আভা ধারণ করিত, ভাবিতাম ইহা বুঝি অভিমানের চিহ্ন, বুঝিবা ক্রোধ হইলে এরূপ হয়, কিন্তু কে জানিত আমাকে দেখিয়া সে মুখখানি রক্তিম হইত। প্রতিদিনই বলিত "আজ তোমার সঙ্গে একটী কথা আছে।" পাছে কি কথাটী জিজ্ঞাসা করি, সেই ভয়ে স্নেহের পুত্তলিকা আমার, আসি বলিয়া পলাইত। সুযোগ ক্রমে কি কথাটী জিজ্ঞাসা করিলে, চন্দ্রলেখা লজ্জায় মুখ নামাই[illegible]। বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারিত না। কেবল [illegible]লিত, "আজ না, কাল বলিব।" তেমন কত কাল যে কাটিয়া গেল, তাহার প্রাণের কথাটী আর শুনা হইল না। আমার তেমন আদরের ধন, সোণার কমলকে কখন ভাল করিয়া সোহাগ করি

নাই। কখন ভাল করিয়া নয়ন ভরিয়া সে মুখখানি দেখি নাই। ভাল করিয়া দেখিব বলিয়া যখনই তাহার দিকে চাহিয়াছি, তখনই আমার চক্ষু চাপিয়া ধরিত। কেন যে সে এরূপ করিত আজ সে কথা ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।

কুমার নীরব হইলে, রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিলেন "চন্দ্রলেখার কি বিবাহ হয় নাই?"

কু। এত দিন হয়ত সে সৌভাগ্যবতী।

রত্ন। যদি বিবাহ হইয়া থাকে তবে আর দুঃখ করিয়া ফল কি?

কু। যত দিন না জীবনের শেষ হইবে, তাহাকে ভুলিতে পারিব না।

রত্নমালা সেই কথা শুনিয়া "আসি" বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শিশিরে নলিনী।

"তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়! প্রণয় কি জুড়াবে?"

হেমচন্দ্র।

রত্নমালা শয়ন কক্ষে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভাবিতে

বসিলেন। কুমারের কোন কথা কি তাঁহার প্রাণে যাতনা দিয়াছে? কুমার তাঁহার বাল্য-প্রণয়ের কথা কহিতেছিলেন, তেমন সুন্দর কথা শুনিতে কি রত্নমালার ভাল লাগিল না? তিনি চন্দ্রলেখাকে ভালবাসেন রত্নমালাকেও বাসেন, তবে রত্ন-মালার এত দুঃখ কিসের? চন্দ্রলেখাকে কুমার ইহজীবনে ভুলি-বেন না। নাই বা ভুলিলেন, তাহাতে রত্নমালার মাথা-ব্যথা কেন? তবে একটী কথা, কুমার চন্দ্রলেখাকে ও রত্নমালাকে উভয়কেই ভালবাসেন। এক জন, দুইজনকে ভালবাসেন, সে কি রকম? বাসিবে না কেন? কিন্তু প্রাণের সহিত যে ভাল-বাসা, তেমনটী একজন ভিন্ন দুইজনকে সমর্পিত হইতে পারে না। রত্নমালা সেই ভাবনাই ভাবিতেছেন।

আমরা বলি, রত্নমালার সেটী ভুল। সাগর কি সমভাবে একাধিক স্রোতস্বিনীকে প্রণয় দানে কখন পরাঙ্মুখ হয়?

রত্নমালা চন্দ্রলেখাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "চন্দ্রলেখা! তোমারত এতদিন বিবাহ হইয়াছে। তোমার প্রাণেশ্বর তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি দুইটী লইয়া কি করিবে? আমি তোমার নিকট একটী ভিক্ষা চাহি-তেছি, আমাকে তোমার একটী প্রাণ দাও, নূতনটী রাখিয়া না হয় তোমার পুরাতনটী দাও। আর যদি তোমার একটীই সম্বল থাকে, তবে চন্দ্রলেখা! তবে আর কি বলিব তোমার যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু জেন নিঃস্বার্থ হইয়া পরোপকার করিলে পুণ্য হয়। অথবা তুমিও কি যুবকের প্রাণের মর্ম্ম বুঝিয়াছ? যদি বুঝিয়া থাক, তুমি লইয়া সুখী হও। আমি আর তোমার দ্রব্যে লোভ করিব না। আমি যে তোমার কুমারকে

আমার প্রাণটী সমর্পণ করিয়াছি, তাহাকে আমার সেটী ফিরিয়া দিতে বলিও। অথবা আমার হইয়া তুমি কেন বলিবে, আমি স্বয়ংই বলিব! কিন্তু ভয় হয়, পাছে তাহার সঙ্গে কথা কহিলে তুমি কিছু মনে কর। তবে কি চন্দ্রলেখা! দুঃখিনীর সেটী—সেই আকিঞ্চিৎকর শুষ্ক প্রাণটী অকূল পাথারে ভাসিয়া যাইবে?”

রত্নমালার মনে কষ্ট হইল। মর্ম্মভেদী চিন্তায় হৃদয় বিদ্ধ হইল। তখন কুমারকে উদ্দেশ করিয়া আবার মনে মনে কহিলেন,—

“কেন, কেন কুমার! আমি তোমার ভালবাসা পাইব না? আমিওত তোমার সেই প্রেমের ভিখারিণী। তবে কেন তোমার আশা পরিত্যাগ করিব? আমিওত তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তবে কেন তুমি আমাকে ভালবাসিবে না? আজ লজ্জার মুখে ছাই দিয়া বলিব, কি বলিব? বলিব কুমার! না না প্রাণেশ্বর! না না ভিখারিণীর ধন! সত্য করিয়া বল, তুমি কাহার?”

আবার তখনই ভাবিলেন “অবোধ মন! সে কি কথা, যদি ভালবাস, তবে কেন তাহার সুখে অসুখী হইতেছ?

না চন্দ্রলেখা! আমি আর তোমার হৃদয়রত্ন পাইবার বাসনা করিব না। আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে, ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন।”

এই বলিয়া রত্নমালা উপাধানে মুখ লুকাইয়া ক্ষণকাল কাঁদিলেন।

সেই প্রেম-পীড়িতা যুবতীর প্রাণের যাতনা দেখিতে সে

স্থানে কেহ কি ছিল না? ভগবান ছিলেন। তিনি সে রোগ আরোগ্যের জন্য অশ্রুবর্ষণরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াদিলেন।

ভগবান! তোমার অসীম দয়া! মনুষ্যকে এ সকল অবস্থায় পড়িতে হইবে জানিয়া তুমি অগ্রেই তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছ। যন্ত্রণায় অস্থির হইলে লোকে তোমার সেই উপায়টী অবলম্বন করে—একবার নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদে।

রত্নমালাও সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে ঘুমাইলেন।

পাঠক! আমরা বঙ্গদেশে যাইয়া চন্দ্রলেখাকে একবার দেখিয়া আসি চলুন। নাহুরখাঁ বিদ্রোহ-শান্তির জন্য বঙ্গদেশে গিয়াছেন, তিনিই বা কতদূর কি করিলেন, চলুন দেখিয়া আসি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একবার হাস না।

"বিরহমসহমনা চক্রবাকী-সমানা,
চকিত-বনকুরঙ্গী-লোচনা কোমলাঙ্গী।"

পুষ্পবাণ-বিলাস।

দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল কিন্তু কুমার আর ফিরিলেন না। চন্দ্রলেখা এক্ষণে চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া। বাল্যকালের মত এখন আর সে চপলতা নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও ভাবান্তর হইয়াছে। তেমন ধরণ ধারণ আর নাই, এখন গজেন্দ্রগমনে ঈষৎ ঠমকে ঠমকে যাওয়া আসা। এখন সদরের বাহির হইতে হইলে ইতঃস্তত করিতে হয়।

পাঠক! এখন একবার মানসচক্ষে চন্দ্রলেখার প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখুন দেখি, যেরূপ শশীর কলাবৃদ্ধি-সহকারে জ্যোৎস্নাধিক্য হইয়া থাকে সেইরূপ চন্দ্রলেখার বয়োবৃদ্ধি সহকারে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না?

একদিন দৈনিক কার্য্য সমাপন করিয়া চন্দ্রলেখা গৃহসংলগ্ন উদ্যানের একটী বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। কুমার বহুযত্নে এই উদ্যানের বৃক্ষগুলি রোপণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর

ধরিয়া পুষ্পোদ্যানের আর তত যত্ন নাই। অনিচ্ছা সত্বেও চন্দ্রলেখা সময়ে সময়ে তাহার তলায় জল ঢালিত। সেই জন্য এখন বৃক্ষগুলি জীবিত ছিল।

চন্দ্রলেখা যাহার তলে আসিয়া বসিল, কুমার বহুযত্নে এই বৃক্ষটীকে রোপণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রলেখা সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল 'কুমার'। সাধ করিয়া বৃক্ষতলে একটী তরুলতিকা রোপণ করিয়াছিল। সাধ করিয়া তরুলতিকার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। তরুলতিকাটী অযত্নে থাকিয়াও এত দিনে পুষ্পভরে ঈষৎ অবনত। সুখের দিনে কুমারের হাত ধরিয়া সেই লতিকাবেষ্টিত বৃক্ষতলে চন্দ্রলেখা বসিতে বড় ভাল বাসিত। কুমার বৃক্ষটীকে লতাবেষ্টিত দেখিয়া একদিন সাধ করিয়া বলিয়াছিলেন "চন্দ্রলেখা! তোমার বাহুলতায় একবার ঐ বৃক্ষটীকে বেষ্টন কর দেখি?"

মরিয়া গিয়াছিল, আজ তাহার সেই কথা মনে পড়িল।

বৃক্ষতলে বসিয়া চন্দ্রলেখা মালা গাঁথিত; কুমার তাহার ফুল ছড়াইয়া দিতেন, সেই জন্য প্রায়ই দুইজনে বিবাদ হইত। কুমার সাধ করিয়া চন্দ্রলেখাকে কাঁদাইতেন। চন্দ্রলেখা কাঁদিতে কাঁদিতে মালা গাঁথিত, কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমানে বৃক্ষশাখায় মালা জড়াইত। কুমার তাহার অনির্ব্বচনীয় ভাব দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেন; আজ তাহার সেই হাসি মনে পড়িল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিল, সুশীলা সেই দিকে

আসিতেছে। সুশীলা আসিয়া চন্দ্রলেখার একপার্শ্বে বসিয়া বলিল "এখানে এমন ভাবে বসিয়া কেন সই ?"

চন্দ্রলেখা কহিল "কায কর্ম্ম নাই তাই বসিয়া আছি।"

সুশী। সই আমার একটী কথা রাখিবে ?

চন্দ্র। কি কথা ?

সুশী। সই তেমনি করিয়া একবার হাস না।

চন্দ্র। ঠাট দেখ, হাসির বুঝি আবার তেমনি আছে।

এই কথা বলিয়া নির্ব্বোধ বালিকার কথায় চন্দ্রলেখা হাসিয়া উঠিল। সুশীলা সেই হাসি দেখিয়া কহিল "এমন নয়, সেই তেমনি হাসি হাস না ?

চন্দ্র। সে আবার কি ?

সুশী। আমি কিনা দেখি নাই! সেই, কুমার যখন তোমার চিবুক ধরিয়া সোহাগ করিতেন, তুমি তখন যেরূপ হাসিতে। যখন গলা হইতে মালা খুলিয়া তোমাকে পরাইতেন, তুমি তখন যেরূপ হাসিতে। আমার হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া কুমারকে এক একবার দেখিতে আর যেরূপ হাসিতে। আমি কিনা দেখি নাই, একবার তেমনি করিয়া হাস না ?

মেঘান্ধকার রজনীতে হঠাৎ চন্দ্রোদয়ে আলোকিত হইয়া আবার তখনি অনুগামী মেঘে আচ্ছাদিত হইলে, পৃথিবী যেরূপ অধিকতর অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চন্দ্রলেখার শোক-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে যদিও কুমার চাঁদ উদিত হইল বটে, কিন্তু অনুগামী নিরাশা-মেঘে পুনরায় আচ্ছন্ন হইল। মনুষ্যের মনোভাব মুখে ব্যক্ত হয়। চন্দ্রলেখার মুখশ্রী আরও

মলিন হইল। ভাবিল "সে আবার কেমন হাসি!" কেমন হাসি বালিকা বুঝিতে পারিল না।

পাঠক বুঝিয়াছেন, সুশীলা কিরূপ হাসি হাসিতে বলিতেছে। চোখে চোখে দেখা হইলে যে হাসি পরস্পরের মনের কথা বলিয়া দিত, ইহা সেই হাসি। কুমার কোমল করে কোমল চিবুক কোমল ভাবে ধারণ করিলে, যে হাসি ঈষৎ কপট বিরক্তি দেখাইয়া ঈষৎ লজ্জা মাখিয়া ঈষৎ আহ্লাদে গলিয়া বলিত "আঃ কর কি?" ইহা সেই হাসি। যখন গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া কুমার চন্দ্রলেখাকে পরাইতেন তখন যে হাসি সোহাগ করিয়া বলিত "তুমি যে বলিয়াছিলে গলায় মালা দিলে বিবাহ হয়, তবে তোমার সঙ্গে আমারত বিবাহ হইল। আজ হইতে আমি তোমার পদসেবা করিব। আজ হইতে আরও তোমাকে ভালবাসিব।" ইহা সেই হাসি। সুশীলার হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে কুমারকে দেখিতে পাইলে যে হাসি মুচকি ভাবে বলিত "এখানে বসিয়া কেন? আমার সঙ্গে এসনা।" সুশীলা সঙ্গে আছে ভাবিয়া যে হাসি আবার ইঙ্গিত করিয়া বলিত "না, এখন না। এখন আসিও না, সুশীলা সঙ্গে আছে।" ইহা সেই হাসি। যে হাসি কুমারের মলিনমুখ বিমল করিত, সুখে ভাসাইত, দুঃখে হাসাইত, প্রাণের হাসি অধরে উঠিয়া নয়নকোণে যাইয়া মনের কথা বলিয়া দিত, ইহা সেই হাসি।

দুই বৎসর চন্দ্রলেখা সে হাসি আর হাসে নাই সুতরাং মনে হইল সে আবার কেমন হাসি? তেমনি ভাবে ঢেউ খেলাইয়া তেমন হাসি সুধাধরে আর উথলিয়া উঠিবে কেন?

সুশীলার তেমনি হাসি দেখিবার সাধ রহিয়া চন্দ্রলেখা বলিল, "তবে না হয় একবার সেই নামটী কর। তোমার মুখে সেই নামটী বড় ভাল লাগে।"

চন্দ্রলেখা বুঝিতে পারিল। বলিল "আমার মনে নাই, ভুলিয়া গিয়াছি।"

ভুলিয়া যাওয়া কতদূর সম্ভব, পাঠককে বলিতে হইবে না। কিন্তু বাস্তবিক চন্দ্রলেখা এখন আর কুমারের নাম মুখে বড় আনিতেন না, যেন কত লজ্জা হইত।

সুশীলা সে সকল কথার আর প্রসঙ্গ না করিয়া বলিল, "দেখ সই! ভাল কথা মনে পড়িল। একটা সন্ন্যাসিনী আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'আমি ভিখারিণী।' ভিক্ষা দিলে লয় না। সে বোধ হয় হাত দেখিতে জানে।

চন্দ্র। তাঁহাকে এখানে একবার ডাক না।

সুশীলা ডাকিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যৌবনে সন্ন্যাসিনী।

"বিপত্রলেখা নিরলক্তকাধরা
নিরঞ্জনাক্ষীরপি বিভ্রতীঃ শ্রিয়ং।
*   *   *   *
অলঙ্কৃতং তদ্বপুষৈব মণ্ডনং॥"
ভারবি।

সুশীলা সন্ন্যাসিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

সন্ন্যাসিনীর বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না। অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত তাঁহার উজ্জ্বল অঙ্গজ্যোতিঃ দেখা যাইতেছিল। যুবতী-সুলভ যৌবন-ভরে দেহখানি ঈষৎ টলটলায়মান। পূর্ণ যৌবনা যুবতী মাত্রকেই এইরূপ টলমল করিতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, পূর্ণ স্তনমণ্ডলের উচ্চতা নিবন্ধন নয়ন দুটী পদযুগল দেখিতে পায় না, সেইজন্য গমনকালে পদস্খলন হেতু তন্বীযুবতীরা উভয় পার্শ্বে ঈষৎ হেলিতে থাকে।

সন্ন্যাসিনীর অবিন্যস্ত কেশরাশি নিতম্ব অতিবাহিত করিয়া বায়ুভরে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। দেখিলে বোধ হয় তাহাতে বহুদিন হইতে তৈলস্পর্শ হয় নাই ; অথচ জটাও বাঁধে নাই। দেহে কোনরূপ অলঙ্কার ছিল না অথচ সর্ব্বাঙ্গ

[illegible]র্থই কি সন্ন্যাসিনী ? তবে কেন লোকালয়ে ভ্রমণ করিতেছে ? সন্ন্যাসিনীত নির্জ্জনে ঈশ্বর-উপাসনায় নিয়োজিতা থাকে। এ সন্ন্যাসিনী সংসারী লোকের নিকট কেন ? পূর্ব্বে বোধ হয়, না বুঝিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবশেষে মুক্তিপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া পুনরায় সংসারী হইতে বাসনা করিয়াছেন। এই কেবল বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম; এই বয়সেই কি সংসারের সকল [illegible]কার সুখ দুঃখ উপভোগ করিয়াছেন ? মানবজীবনে যে সকল বাসনা মনে সর্ব্বদাই নূতন নূতন ভাবে উত্থিত, উদ্ভাবিত এবং নিঃশেষিত হয়, সে সকল বাসনা কি মিটিয়াছে ? যদি সকলই সম্ভব হয়, তবে কেমন করিয়া সেই বাসনা—সেই দুর্দ্দমনীয়

ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন? সকলই শুনিতাম, সকলই মানিতাম যদি উপযুক্ত সময়ে যুবতীকে সন্ন্যাসিনী বেশে দেখিতাম। এত সে সময় নয়, এ যে পূর্ণ যৌবন! যে যৌবনে মানব নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিমোহিত হয়। পৃথিবী সরাতুল্য বোধ হয়। এরূপ সময়ে কেমন করিয়া যুবতীকে যথার্থ সন্ন্যাসিনী বলিয়া স্বীকার করিব। যুবতীর মানস নদীতে এখনও প্রেমের জোয়ার বহিতেছে; একে জোয়ার তাহাতে প্রবল তরঙ্গ। সে তরঙ্গে পড়িলে, আমিত আমি, তুমি ত তুমি, মহাজিতেন্দ্রিয়কেও হাবু ডুবু খাইতে হয়। এরূপ পূর্ণ জোয়ারে কি সূক্ষ্ম, নির্ম্মল এবং পবিত্র ঈশ্বর চিন্তা স্থান পায়! যদি কখন পাইবার চেষ্টা করে, অথবা বহু পরিশ্রমে বহু যত্নে যদি কখন বাসনার অজ্ঞাতসারে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেরূপ পবিত্র চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া যায়, কোথা হইতে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব প্রেমের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ঈশ্বর চিন্তাকে ওলট পালট খাওয়াইয়া ভাসাইয়া দেয়। অতএব যুবতীর যোগধর্ম্ম সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সন্ন্যাসিনী চন্দ্রলেখার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। চন্দ্রলেখা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ি কোথা?"

সন্ন্যা। আমার বাড়ি সর্ব্বস্থানেই।

চন্দ্র। তোমার কে আছে?

সন্ন্যা। আমার আর কেহ নাই, আমি একাকিনী।

চন্দ্র। তুমি কি সন্ন্যাসিনী?

সন্ন্যা। সন্ন্যাসিনী নহি, আমি ভিখারিণী।

তখন সুশীলা ব্যস্ত ভাবে কহিল "কৈ কাহার নিকটত ভিক্ষা চাহিতে দেখিলাম না।"

সন্ন্যা। সে ভিক্ষা যাহার তাহার নিকট চাহিবার নয়।

চন্দ্র। ভিক্ষার কি আবার রকম আছে?

সন্ন্যা। আছে বৈকি!

চন্দ্র। সে কিরূপ ভিক্ষা?

সন্ন্যা। প্রেম ভিক্ষা।

চন্দ্র। প্রেম ভিক্ষা কিরূপ? কাহার নিকট চাহিতে হয়?

সন্ন্যাসিনী চন্দ্রলেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন মুখমণ্ডলে এখন বাল্যভাব ঢল ঢল করিতেছে। কহিলেন "ভালবাসা কাহাকে বলে জান?"

চন্দ্রলেখা অম্লানবদনে কহিল "জানি।"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন "ভালবাসারই অন্যতম নাম প্রেম। যখন কাহাকেও ভালবাসিবে, ভালবাসিয়া যখন মনে করিবে, "সে কি আমায় ভালবাসে?" আকাঙ্ক্ষিত চক্ষে যখন তাহার নয়ন পানে চাহিবে, জানিও, তুমি তখন তাঁহার নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিতেছ।"

চন্দ্রলেখা স্থির চিত্তে সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিল, কিন্তু কিছুই বুঝিল না।

প্রেমের অনন্ত মহিমা কি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা [illegible]তে পারে? যে প্রেমে জলে শিলা ভাসিয়াছিল, বান[illegible] সঙ্গীত গাইয়াছিল, সে প্রেমের কথা তুমি আমি কোন ছার, মুনি ঋষি ধ্যানেও তাহার অন্ত পান না। সেই প্রেমই আবার অন্যরূপ ধারণ করিয়া যুবক যুবতীকে আনন্দে বিভোর

করিয়া ফেলে। প্রেমের আঘ্রাণ যে পাইয়াছে সেই মরিয়াছে। প্রেম যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকে হাসিতেও হইয়াছে কাঁদিতেও হইয়াছে। প্রেমের নিগূঢ় মর্ম্ম যদি জানিতে চাও, তবে এই অনন্ত পৃথিবী মধ্যে ঐ যে যুবতী মানস নেত্রে কেবল মাত্র একটী যুবকের বদনেন্দু পানে চাহিয়া পুষ্পশয্যা রচনা করিতেছে, অথবা ঐ যে যুবক একবার মাত্র চক্ষের দেখা দেখিব বলিয়া ললনার চারুনয়ন পানে চাহিয়া আছে, সাধ মিটিতেছে না বলিয়া পলক পড়িতেছে না, উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর বলিয়া দিবে, প্রেম কি। প্রেম জগতের প্রত্যেক দ্রব্যের প্রত্যেক পরমাণুতে বাস করে। বৃক্ষ, লতা, ফুল, নদ, নদী, চাঁদ, পাখী, মৃদুল অনিলাদিতে বাস করে। না করিলে লতিকা বৃক্ষকে জড়াইত না। কাননে কুসুম হাসিয়া হাসিয়া ফুটিত না। নদী নদে পতিত হইয়া সংযমিত হইত না। চাঁদ লহরীর সঙ্গে মিশিয়া নাচিতে নাচিতে কুমুদিনীকে ধরিতে যাইত না। পাখী ডালে বসিয়া সুমধুর গীত গাইত না। কোকিল কুহুরবে জগৎ মাতাইত না। মৃদুল পবন লম্পটতা করিয়া রমণীর বুকের কাপড় উড়াইত না। প্রেমের লীলা অনন্ত। প্রেম বর্ণনাতীত।

চন্দ্রলেখা কহিল, "তুমি কাহার নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিবে?"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "যঁাহার নিকট——এ জনমে আর কি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব।"

চন্দ্রলেখা এতক্ষণে বুঝিল, সন্ন্যাসিনী যে প্রেমের ভিখারিণী চন্দ্রলেখাও তাই। যে স্থানে মিল সেই স্থানেই মিলন। . . .

চন্দ্রলেখা কহিল, "আজ হইতে তোমাতে আমাতে 'সই'।"

সন্ন্যা। বেশত আমিও তাই চাই।

চন্দ্র। সই! আর তুমি এখানে কয়দিন থাকিবে?

সন্ন্যা। কেবল আজিকার রাত্রি।

চন্দ্র। তবে সই! তুমি আমার সই বলা ফিরাইয়া দাও।

সন্ন্যা। সেজন্য দুঃখিত হইও না। তোমার এই প্রেমময় মুখখানি কখনই ভুলিব না। চিরদিন তোমার সই বলা মনে রাখিব। যদি ঈশ্বর করেন আবার দেখা হইবে।

চন্দ্রলেখার নিকট বিদায় লইয়া সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

"The big round tears
Cours'd one another down——
In piteous chase !!"

SHAKESPEARE.

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলে কয়েক দিবস পরে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে পিতা ও পিতামহীর সহিত চন্দ্রলেখা গঙ্গাস্নান করিতে ত্রিবেণী আসিল।

আজ চন্দ্রগ্রহণ। বহুদেশীয় নরনারী আজ পবিত্র সলিলা

জাহ্নবীর জলে স্নান করিবার জন্য ত্রিবেণীর ঘাটে সমবেত হইয়াছে। ভাগীরথীর তীর ও নীর লোকে থৈ থৈ করিতেছে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক, কেহ বা সন্তান ক্রোড়ে করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রকৃতির শোভা দেখিতেছে, যাহারা সে ধনে বঞ্চিত, তাহারা ভাগীরথী জলে দাঁড়াইয়া গললগ্নকৃতবাসে পুত্র সন্তান কামনা করিতেছে। বালক বালিকারা জল ক্রীড়া করিতেছে। বিবাহ যোগ্যা কুমারীগণ মনে মনে গঙ্গার নিকট মনোমত পতি কামনা করিতেছে। কেহ বা স্নান সমাপনান্তে সিক্ত বস্ত্রে সিক্ত কেশে দাঁড়াইয়া গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গাহত নৌকাদি অবলোকন করিতেছে। স্থানটী স্ত্রীসুলভ কোলাহলে এবং সধবা ও কুমারীগণের অলঙ্কারের ঢন্ ঢন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে পরিপূর্ণ। সেই কোলাহল ও অলঙ্কারের শব্দে ভাগীরথীর কুল কুল ধ্বনি বিমিশ্রিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুশ্রাব্য শব্দ আকাশ পথে উত্থিত হইতেছে।

সেই জনতার মধ্যে স্নান সমাপন করিয়া আমাদের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কুমারী অলঙ্কারাবৃত কলেবরে দাঁড়াইয়া তৎকালীন বায়ুতে আলুলায়িত সিক্ত কেশ শুকাইতেছিল, শুকাইতে শুকাইতে ভাগীরথী জলে মলিন চন্দ্রের কিরণরাশি তরঙ্গে তরঙ্গে যেরূপ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, তাহাও দেখিতেছিল। এমন সময় অনতিদূর হইতে সন্ন্যাসিনী আসিয়া তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। চক্ষু হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া চন্দ্রলেখা বিস্ময়পূর্ণ নয়নে কহিল,—

"কেরে সই যে! সই তুমি এখানে?

সন্ন্যা। বলি সই চিনিতে পার?

চন্দ্র। চিনিতে পারিব না! তোমাকে প্রতিদিনই মনে হইত। সই ভাল আছ?

সন্ন্যা। আমার আবার ভাল, তুমি কেমন আছ বল। মাথায় সিন্দুর কৈ? এখনও কি কুমারী আছ! বিবাহ হয় নাই?

চন্দ্রলেখা লজ্জাবনত মুখে মৃদুস্বরে কহিল, "না।"

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এরূপ সময় একটী নৌকা আসিয়া তীর সংলগ্ন হইল। নৌকা হইতে একজন নাবিক লম্ফপ্রদান করিয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া কহিল,—

"ওগো বাছা, তোমাদের লোক এই নৌকায় চড়িয়াছে, এস, শীঘ্র এস, নৌকায় উঠ।"

চন্দ্রলেখা থতমত খাইয়া ভাবিল, তাহার পিতা ও পিতামহী নৌকায় উঠিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে।

চন্দ্রলেখা বাষ্পপূর্ণলোচনে সন্ন্যাসিনীকে কহিল, "এস না সই আমাদের নৌকায় এস না? তোমার সঙ্গে আরও অনেক কথা আছে আবার না হয় নামিয়া আসিবে।

সন্ন্যাসিনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত যাইয়া নৌকারোহণ করিল।

তখন নাবিক কহিল, "নৌকা খোল্।"

চন্দ্রলেখা সন্ন্যাসিনীর সহিত নৌকা'পরি উঠিয়া দেখিল, নৌকামধ্যে কেবল কয়েকজন অস্ত্রধারী পুরুষ বসিয়া কি কথা কহিতেছে। বালিকা তখন শোকাকুলা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল "ঠাকুর মা! ঠাকুর মা! ও ঠাকুর মা!" কিন্তু কোথায় ঠাকুর মা! কেবল তরণীখানি 'ঠাকুর মা' 'ঠাকুর মা' শব্দে

প্রতিধ্বনিত হইয়া ভাগীরথী বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া নৈশ বায়ুর মধ্যে কল্ কল্ শব্দে তরঙ্গাহত হইয়া হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে ছুটিয়া চলিল। ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না মাখান জলের উপর নৌকার যে সকল আলো পড়িয়াছিল, সেই আলো উর্ম্মীমালার সহিত বিবাদ করিতে করিতে নৌকার অগ্রে অগ্রে, পার্শ্বে পার্শ্বে, পশ্চাতে পশ্চাতে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিল। কেহই হতভাগিনীর কথায় কর্ণপাত করিল না। চন্দ্রলেখা অস্ত্রধারীদের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "ওগো আমার ঠাকুর মা কোথায় ?"

একজন বিকৃত স্বরে কহিল, "কোথা তোর ঠাকুর মা! ফের যদি চিৎকার করিবি ত গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিব।"

চন্দ্রলেখা ভয়-কম্পিত-কলেবরে বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় নৌকা'পরি নিপতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইল। সন্ন্যাসিনী অধীরা না হইয়া অঞ্চলের বাতাস দিয়া বালিকার সংজ্ঞা-লাভ করিলেন। চন্দ্রলেখা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল,—

"কোথায় সেই চারুগ্রাম! কোথায় দ্বারকেশ্বর! কোথায় বা কুঞ্জবন! কোথায় বা পুষ্পবৃক্ষগুলি! কে তাহাতে আর জল দিবে? কে আর প্রদোষকালে মালা গাঁথিয়া মালা হস্তে কাঁদিতে বসিবে? কোথায় সেই স্নেহময় পিতা! আর কাহাকে তিনি আদর করিবেন? কোথায় সেই বৃদ্ধা পিতামহী! আর কাহার তিনি বদনের স্বেদ বিন্দুগুলি অঞ্চলে মুছিয়া দিবেন? আর সেই প্রাণের কুমার! কে আর হতভাগিনী চন্দ্রলেখার মত তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবে? আর কাহাকেই বা তিনি সোহাগ করিয়া মধুর মুখে তখনকার মত কখন

সৌদামিনি কখন সুহাসিনি কখন বা সোহাগিনি সম্বোধনে ডাকিবে? কে আর নির্জ্জনে, গোপনে, অন্ধকারে, দিবালোকে, চন্দ্রালোকে, জাগ্রতে, স্বপনে তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তি ভাবিবে? সেই প্রাণের কুমার! তাঁহার সঙ্গে এ জনমে আর দেখা হইল না, সেই মুখখানি এ জনমে আর দেখা হইল না, তেমন মধুমাখা কথা এ জনমে আর শুনা হইল না; কত কথা বলিবার ছিল এ জনমে আর বলা হইল না। ভগবান! পরজন্মে যেন তাঁহার দেখা পাই।"

ভাবিতে ভাবিতে বালিকা আবার জ্ঞান শূন্য হইয়া নৌকা'পরি নিপতিত হইল। নৌকা সমভাবে ছুটিল।

এদিকে পিতা ও পিতামহী উন্মত্তের ন্যায় সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। প্রাণ-সম কন্যার শোকে পিতা ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন। বৃদ্ধা জীবন-মৃতা হইলেন। অবশেষে ভাগীরথী জলে দস্যু হস্তে প্রাণ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ত্রাহিমাং মধুসূদন!

"চিন্ময়ন্তী জগন্মূর্ত্তিং পরং ব্রহ্মস্বরূপিণং॥"

স্ত্রীলোকেরা নৌকা মধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাজের

আদেশে অস্ত্রধারী পুরুষেরা নৌকার বাহিরে আসিল, কেবল মাত্র দস্যুরাজ একা সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

দস্যুরাজকে দেখিয়া সন্ন্যাসিনী ভাবিলেন "ইহাকে কোন রূপ কৌশলে মুগ্ধ করিতে পারিলে আমাদের প্রাণ বাঁচিবার সম্ভাবনা।"

সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

দস্যুরাজ হাসিয়া কহিল "তোমার মত সুন্দরীর নিকট পরিচিত থাকিতে কার না বাসনা হয়! আমি দস্যুরাজ।"

চতুরা কহিলেন, "দস্যুরাজ! আপনি না বুঝিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, যদি আমার স্বামী আমাদের অনুসন্ধানে আসিয়া আপনাদের সন্ধান পান, আপনাদের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।"

দস্যুরাজ কহিল "কে তোমার স্বামী?"

সন্ন্যাসিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে কি কথা! স্বামীর নাম কি মুখে আনিতে আছে? তবে এই মাত্র বলিতে পারি তিনি সম্রাটের সেনাপতি, তাঁহার হস্তে অনেক ফৌজ। তিনি আমাকে লইয়া মুর্শিদাবাদে যাইতেছিলেন। আমি গ্রহণে স্নান করিবার জন্য ত্রিবেণীর ঘাটে নামিয়াছিলাম। তিনি ফৌজ লইয়া কিছু দূরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

দস্যুরাজ গম্ভীর স্বরে কহিল, "এ সংবাদে দস্যুরাজ ভয় করে না।"

সন্ন্যাসিনী উপায় ব্যর্থ হইল দেখিয়া অন্য কৌশল খাটাইয়া কহিলেন, "আপনি এমন সুন্দর পুরুষ, আপনার দস্যু-কার্য্যে প্রবৃত্তি কেন? আপনার নামটী কি শুনিতে পাই না?"

যুবতীকণ্ঠের এরূপ কথায় কার না প্রাণ নাচিয়া উঠে? দস্যুরাজ রমণীর মধুর বাক্যে বিমোহিত হইয়া কহিল, "আমার নাম প্রেমদাস। যে রমণী আমাকে ভালবাসে আমি তাহারই প্রেমের দাস। যদি দয়াকর, আজিকার মত তোমার দাস হইতে পারি।"

সন্ন্যাসিনী বুঝিলেন, আর যায় কোথা! জালে বাঁধা পড়িয়াছে। কহিলেন, "এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনি আমাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিবেন? যদি দেখেন তবে আজিকার মত কেন? কাল কি আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন?"

চতুর দস্যুরাজ কহিল, "সুন্দরি! এ কথার উত্তর কাল দিব। তুমি আজিকার মত সম্মত আছ কিনা বল।

সন্ন্যাসিনী বিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া বুঝিলেন যে, পিশাচের হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে। দস্যুরাজের প্রতি স্মিত নয়নে কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোক কি পুরুষের এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? মনে করুন, যদি সম্মত না হই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?

দস্যুরাজ হাসিয়া কহিল "সম্মত না হইলে, অপর কিছু করিব না; কেবল মাত্র বল পূর্ব্বক তোমার কোমলাঙ্গের স্পর্শসুখ উপভোগ করিব।"

সন্ন্যাসিনীর হৃদয় শিহরিল। প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিতে কহিলেন, "আপনার মত যুবকের নিকট যুবতী কি অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারে! তবে কিনা আপনার সম্পূর্ণ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছি।"

দস্যুরাজ কৌতূহলী হইয়া কহিল, "অমঙ্গল আশঙ্কা কি জন্য ?

তখন সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আমি একজন সম্ভ্রান্ত সেনাপতির পত্নী হইয়াও দেখিতেছেন, আমার গাত্রে অলঙ্কারাদি নাই। আমার একটী সন্ন্যাস ব্রত আছে। ব্রত সমাপ্ত না হইলে পুরুষকে স্পর্শ করিতে নাই। ইহা এমনি কঠোর ব্রত, যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। তাই ভয় হয়, পাছে আমার দ্বারা আপনার কোন অমঙ্গল হয়।"

দস্যু। তবে তোমার সঙ্গিনীকে আমার হইয়া দুকথা বুঝাইয়া বল।

সন্ন্যাসিনী নূতন বিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন—

"মহাশয়! সঙ্গিনী আমার নিতান্ত বালিকা। দেখিতেছেন এখন শোকে অভিভূতা, প্রকৃতিস্থ হইলে বুঝাইয়া বলিব। আপনি এখন বাহিরে যান, আমি ইহার জ্ঞানলাভ করাই।"

দস্যুরাজ বাহিরে আসিলে সন্ন্যাসিনী মুদিত নয়নে শ্রীমধুসূদনের পদ-চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান রাখিলে কার সাধ্য নষ্ট করে।

যখন যামিনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন নৌকার বাহিরে অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ শ্রুত হইল। সন্ন্যাসিনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, রুধির স্রোতে তরণী ভাসিতেছে। দেখিতে দেখিতে দস্যুগণ একে একে দ্বিখণ্ড হইয়া নৌকোপরি নিপতিত হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসিনী মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, আর একখানি তরণী তাহাদের নৌকা সংলগ্ন হইয়াছে। তাহাতে কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ দস্যুগণের উপর অস্ত্রচালনা করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে দস্যুরাজ ভল্লবিদ্ধ হইয়া সলিলোপরি নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

সেই সময়ে চন্দ্রলেখার জ্ঞান হইতেছিল, অস্ত্রের শব্দ শুনিয়া আবার মূর্চ্ছিতা হইল। তাহাকে তদবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসিনী কহিলেন "সই চন্দ্রলেখা! সই রে! এমন সময় কেন পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলে?

এ কি চন্দ্রলেখা! না, না, এত সে চন্দ্রলেখা নয়! সে চন্দ্রলেখা হইলে তেমন মনোহারিণী প্রফুল্ল কমলকান্তি কৈ? তেমন সহাস্য মধুরতাময় প্রফুল্লতা কৈ? তেমন চিত্তস্নিগ্ধকর বিমল বদন-লাবণ্যই বা কৈ? এ যে প্রাতঃকালীন শুষ্ক চাঁদ! এত সে চন্দ্রলেখা নয়!

দেখিতে দেখিতে একজন উষ্ণীষধারী বীরপুরুষ স্ত্রীলোক-দিগের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আর কোন ভয় নাই, তোমরা রক্ষা পাইয়াছ।"

সম্মুখে পুরুষ রত্ন দেখিয়া সন্ন্যাসিনী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

উষ্ণীষধারী কহিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমাদের শত্রু-বধকারী দিল্লীশ্বর-প্রেরিত সেনাপতি।"

সন্ন্যাসিনী পূর্ব্বস্বরে কহিলেন "আপনার পাঠানের বেশ দেখিতেছি। আপনি কি পাঠান?"

উষ্ণীষধারী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! পাঠান নহি

আমি হিন্দু। আমার নাম মুকুন্দ। এক সময় পরিচয় পাইবে। আর তোমাদের কোনরূপ বিপদ আশঙ্কা নাই। তোমার সঙ্গিনী যাহাতে চেতনা-লাভ করেন তাহার চেষ্টা কর।”

আগন্তুকের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার অভয়সূচক মিষ্ট বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিনীর শরীর লোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম অতলজলে ডুবিয়া গেল। তেমন আয়ত লোচনের তত যে বিশাল দৃষ্টি, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাও নিম্নগামী হইল।

এই স্থানেই পাঠক! যুবতীর যোগধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ। এই স্থানেই যুবক যুবতীর পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, ভক্তি, স্নেহ, যাহা কিছু সব সেই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব প্রেমের সাগরে হাবুডুবু।

তাহার পর সন্ন্যাসিনী চন্দ্রলেখার সংজ্ঞালাভ করাইলেন। যখন তাহার উত্তমরূপ জ্ঞান হইল, তখন নাহরখাঁ কহিলেন “তোমরা উভয়েই আমার সঙ্গে এস।”

উভয়েই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে যাইয়া অপর একটী নৌকায় আরোহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

প্রাণের কথা।

"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি পাও—
থাক্ তবে কি কায স্মরিয়া?"

মেঘনাদবধ।

নাহরখাঁ স্ত্রীলোক দুটীকে লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে যদি বিদ্রোহের শান্তি হইয়া থাকে, তিনি যেন অবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করেন; কারণ শীঘ্রই সহ্বরামীদের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা। এ সংবাদে তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। ইচ্ছা ছিল স্ত্রীলোক দুটীকে যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অগত্যা তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এবং নিজ আবাসেই স্থান দান করিলেন।

মনুষ্যজীবনে শোক, দুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নয়। পিতা মাতা পুত্রকন্যার শোকে দুই দিন দশ দিন শোকাকুল থাকিয়া আশ্বাসিত হন। পুত্রকন্যাও পিতামাতার শোকে কিছুদিন মুগ্ধ থাকিয়া ক্রমে ক্রমে স্থিরচিত্ত হয়। পিতামাতা এবং আত্মীয় জনের বিচ্ছেদে যাতনা হয় সত্য, কালক্রমে তাহা লয় প্রাপ্তও হয়। কিন্তু যাহার সহিত প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ-হেতু একের পরমাণু অপরের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে তাহার বিচ্ছেদ যাতনা আজীবন সহ্য করিতে হয়।

মুকুন্দদাসের আশ্রয়ে আসিয়া অবধি চন্দ্রলেখা সন্ন্যাসিনী

সহবাসে সুখে দুঃখে কাল কাটাইতেছিল। সন্ন্যাসিনী নানা-রূপ সান্ত্বনা বাক্যে তাহার দুঃখ শান্তি করিতেন। একদিন চন্দ্রলেখা একাকিনী চিন্তামগ্না হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় সন্ন্যাসিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সই! আজ আবার কি ভাবিতেছ? বলিয়া বলিয়া তোমাকে পারিলাম না। দেখ দেখি, এমন সোণার চাঁদ মুখ, তাও কালি হইয়া আসিল। ছি! এমন করে আর ভেব না।

চন্দ্র। না সই, আমিত আর সে সব কিছু ভাবি না!

সন্ন্যা। যদি ভাব না, তবে আজ এমন ভাবে বসিয়া কি ভাব্‌ছিলে?

চন্দ্র। কি আর ভাবিব, কিছু না।

সন্ন্যা। না, নিশ্চয়ই তুমি কি ভাবিতেছিলে। আমাকে বলিবে না? এই বুঝি তোমার সই বলা?

এতদিন চন্দ্রলেখা সন্ন্যাসিনীর নিকট তাহার প্রাণের কথাটী গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ আর কোন প্রকারে গোপন রাখিতে না পারিয়া কহিল,—

"সই, আজ একটী নূতন ভাবনা ভাবিতেছিলাম।"

সন্ন্যা। আজ আবার নূতন ভাবনা কোথায় পেলে? বুঝি কাহাকেও দেখিয়া মনে ধরিয়াছে?

চন্দ্র। না সই, সে সব কিছু নয়, আজ আমার কেমন যেন বোধ হইতেছে, যেন তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যা। তিনি কে সই?

চন্দ্র। ছাই, কি বলিতে কি বলিলাম, তিনি আবার কে? সই আমার আবার কে আছে?

সন্ন্যা। আমার নিকট প্রাণের কথা লুকাইতেছ, তবে বল তুমি আমাকে ভালবাস না!

চন্দ্র। তোমাকে ভালবাসি না! তবে বাসি কাকে?

সন্ন্যা। তবে তোমার মনের কথাটী খুলিয়া বল, আমাকে বলিতে লজ্জা কি? বুঝিয়াছি, মনে মনে কাহাকে ভালবাস, কে সই?

চন্দ্র। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই।

সন্ন্যা। তাঁহার নাম কি?

চন্দ্রলেখা নাম বলিতে গেল, লজ্জায় মুখ হইতে বাহির হইল না, আকাশ পাতাল ভাবিয়া কহিল,—

"আমার মনে নাই, ভুলিয়া গিয়াছি।

সন্ন্যা। আর লজ্জা কেন! কি নামটী বল না।

চন্দ্রলেখা অবনতমুখী হইয়া মৃদু-মধুর-স্বরে কহিল,— "কুমার।"

নামটী উচ্চারিত হইতে হইতে চন্দ্রলেখার শরীর কণ্টকিত করিয়া সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠে যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইল।

সন্ন্যা। তাঁহাকে তুমি কোথায় কিরূপে ভালবাসিতে শিখিলে বল, আমার শুনিতে বড় সাধ হইতেছে।

চন্দ্র। সে সকল কথা বলিয়া কি শেষ করা যায়।

সন্ন্যাসিনীও প্রেমিকা, চন্দ্রলেখার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—

"সইএর আমার যথার্থই প্রেমময় মুখখানি। তোমার ভালবাসার কাহিনী যে সমাপ্ত হইবার নহে, সে কথা মিথ্যা নয়।" কৌতূহলবশতঃ কহিলেন,—

"সই, তুমি এখনও বালিকা, বালিকা বয়সে কিরূপে ভালবাসিতে শিখিলে? তোমার বাল্য-প্রণয় শুনিতে বড় সাধ হইতেছে।"

চন্দ্রলেখা কহিল, 'সই রে, সে সকল কথা মনে পড়িলে আর কিছুই থাকে না। শুনিয়াছি আমি যখন এক বৎসরের, তখন কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পিতার নিকট রাখিয়া যান। তাঁহার তখন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম। কিছু দিন গত হইলে আমার যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম আকাশের চাঁদের মত আমাদের বাড়িতেও একটী চাঁদ রহিয়াছে। আকাশের চাঁদ ধরা যায় না, কিন্তু সে চাঁদটী আমি ধরিতাম। আমি নির্জ্জনে তাঁহার সেই হাসিভরা চাঁদ বদনটী দেখিতে বড় ভালবাসিতাম। তিনি যদি আমার মুখের দিকে চাহিতেন, সই, আমার বড় লজ্জা হইত। আমি কুসুমের মালা গাঁথিয়া ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার গলায় দিতাম। আমার চিবুক ধরিয়া বলিতেন, "চন্দ্রলেখা! আমাকে কি বরমাল্য দিলে?" আমি সে কথার উত্তর কি, না জানিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। গলা হইতে মালা খুলিয়া আমার গলায় পরাইতে আসিলে, কেন যে সই, আমি লজ্জা পাইয়া পলাইতাম জানি না। দেখ সই! এক দিন আমি পলাইতে পারি নাই—যেমন পলাইতে যাইব অমনি হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তার পর আমার গলায় মালা পরাইয়া দিয়া কহিলেন,—

"চন্দ্রলেখা! আজ হইতে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হইল জান?"

আমি না বুঝিয়া বলিলাম,—

"কেন জানিব না, আজ হইতে আমি তোমার ফুলের মালা হইলাম।" তার পর—তার পর সই—।

চন্দ্রলেখা নীরব হইল।

সন্ন্যাসিনী কুতূহলী হইয়া কহিলেন, "তার পর কি হইল সই?"

চন্দ্র। সই! তার পর, তার পর সই—

সন্ন্যা। তার পর তিনি কি বলিলেন, বলনা সই!

চন্দ্রলেখা তখন মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "তার পর সই, আমার মনে নাই, তার পর তিনি কি বলিলেন, কি করিলেন, কি বা হইল আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

সন্ন্যা। ভুলিয়া গিয়াছ বৈ কি। এই বুঝি তোমার ভালবাসা, আমার কাছে লজ্জা কি? ছি!

চন্দ্র। দুঃখিত হইও না সই। তার পর তিনি বলিলেন, "তুমি যদি আমার ফুলের মালা, তবে আমার মালা আমি গলায় পরি।" এই বলিয়া আমাকে গলায় পরিলেন।

সন্ন্যাসিনী তখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তুমিত আর বাস্তবিক মালা নও, তবে তোমাকে গলায় পরিলেন কি প্রকারে?"

চন্দ্র। না সই, তোমাকে আম পারিব না।

বালিকাকে অপ্রস্তুত করা বিধেয় নয় বুঝিয়া সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "তার পর সই?"

চন্দ্র। সই, তার পর আর কি বলিব, এইরূপে বালিকা বয়সে তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিলাম। কি জাগ্রতাবস্থায়, কি নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়েই তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তি

দেখিতাম। মনে হইত ঈশ্বর কি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, যে আমি যাবজ্জীবন আমার সেই দেবের পূজা করিতে পাইব। সই রে! মনে কতই যে সাধ হইত, ভাবিতাম যদি কখন দুঃখের দিন আইসে,স্বয়ং সকল দুঃখ ভোগ করিয়া যত্নে রাখিয়া তাঁহার দুঃখের শান্তি করিব। যদি রবি-কিরণে মুখখানি রঞ্জিত হইয়া ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিত, মনে হইত নিকটে যাইয়া অঞ্চল দিয়া মুছিয়া দিই। পাপ লজ্জা আসিয়া বাধা দিত। মনে করিতাম, যদি কখন তিনি আমার হন, যদি তখন তাঁহাকে এইরূপ স্বেদসিক্তাননে অবলোকন করি, তখন মনের সাধ পুরাইব। সই, মনের সাধ মনে রহিল এ জনমে আর পুরিল না।”

বলিতে বলিতে চন্দ্রলেখার চক্ষে জল আসিল।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, “মনে যদি বেদনা পাও, বলিবার আবশ্যক নাই।” উভয়েই নীরব হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশ্বাসে।

“মনেতে জানিল এই পুরুষ রতন সেই
দরশন পাইব কিরূপে।”

কবিরঞ্জন।

কুমার মুকুন্দদাসের বাটীতে কখন সপ্তাহান্তরে কখন

পক্ষান্তরে কখন মাসান্তরে আসিতেন। অন্তঃপুরে যে চন্দ্রলেখা আছে জানিতেন না। কেবল মাত্র মুকুন্দদাসের মুখে একদিন শুনিয়াছিলেন যে,তিনি দস্যুদমনে যাইয়া দস্যুহস্ত হইতে দুইটী স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিয়া নিজ বাটীতে আনিয়াছেন। একদিন মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বহির্বাটীতে কুমার একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী অপরিচিতা রমণীকে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন,

"সুন্দরি! কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি, বাধা না থাকিলে বলিবেন কি?"

স্ত্রীজাতি একে স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা, তাহাতে কেহ যদি সুন্দরি বলিয়া সম্বোধন করে, লজ্জায় মরিয়া যায়। সন্ন্যাসিনী লজ্জার তত ধার ধারিত না। সুন্দরি সম্বোধন শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, নবকান্তিবিশিষ্ট নব্যযুবক তাঁহাকে সুন্দরি বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। অগ্রসর হইয়া কহিলেন,

"কেন মহাশয়?"

কু। আপনারাই কি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন?

সন্ন্যা। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।

কু। আপনাকে যে একাকিনী দেখিতেছি?

সন্ন্যা। একাকিনী নহি, আমার একটী সঙ্গিনী অন্তঃপুরে আছেন।

কু। আপনার সঙ্গে তাঁহাকে কৈ দেখিলাম না?

সন্ন্যা। সঙ্গিনী আমার বড় লজ্জাশীলা, বাহিরে আসিতে ভালবাসে না। পুরুষ দেখিলে সই চন্দ্রলেখা বড়ই সঙ্কুচিতা হয়, সেই জন্য সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে থাকে।

চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা! পাঠক! কুমারের কর্ণে চন্দ্রলেখা! সে কি নাম? চন্দ্রলেখা কি কুমারের পরিচিত নাম? যদি পরিচিত হয়, তবে একি সেই চন্দ্রলেখা? ইহা ত সেই চারু-গ্রাম নয়! এ স্থানে ত সেই বাল্যকালের বিচরণ-স্থান তেমন উপবন নাই। সেই চাঁদ, সেই ফুল, সেই দ্বারকেশ্বরের কুল কুল, সেই পুষ্পদাম, তেমন নয়ন-তৃপ্তিকর চিত্ত-স্নিগ্ধকর কিছুই নাই! এ যে দিল্লী! তবে বুঝি এ সে চন্দ্রলেখা নয়!

কুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,

"কি নামটী আর একবার ভাল করিয়া বলুনত? চন্দ্রলেখা!—চন্দ্রলেখা আপনার সই! তিনি কি লজ্জাশীলা বালিকা?"

সন্ন্যাসিনী বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কেন মহাশয়! আমার সই কি আপনার পরিচিতা?"

কুমার লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনার সই আমার পরিচিতা হইবেন কেন?—চন্দ্রলেখা আমার পরিচিতা।

সন্ন্যা। হইতে পারে, তা বলিয়া আমার সই যে আপনার পরিচিতা হইবেন তাহারই নিশ্চয়তা কি?

কু। পূর্ব্বে জানিতাম না জগতে চন্দ্রলেখা বলিয়া আর কেহ আছে কিনা?

প্রেমিকা সন্ন্যাসিনী কুমারের অন্তরের কথা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "পূর্ব্বে জানিতাম না যে, পুরুষ প্রেমে বিহ্বল হইয়া অজ্ঞানের মত কথা কহে। পৃথিবীতে আর কাহারও কি চন্দ্রলেখা নাম থাকিতে নাই? আপনি যাহার কথা বলিতেছেন, তিনি আপনার কে?"

কু। সে কথায় আর কায কি?

সন্ন্যা। আপনার নাম কি, শুনিতে পাই না?

কু। কুমার সিংহ।

নাম শুনিয়া সন্ন্যাসিনীর চৈতন্যলাভ হইল, চন্দ্রলেখার কুমারের কথা, তখন তাঁহার মনে পড়িল। তখন যুবককে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন, সেই ভুবনমোহন রূপ—সেই তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ দেবমূর্ত্তি! তখন আহ্লাদিতা হইয়া কহিলেন, "চন্দ্রলেখা আপনার কে?"

কুমার কহিলেন, "সুন্দরি! আর পরিচয় লইয়া কি হইবে?"

সন্ন্যা। আমাকে ভিখারিণী বলিয়া সম্বোধন করিবেন। আচ্ছা, তাঁহার বয়ঃক্রম কত? রূপই বা কিরূপ?

কু। বয়ঃক্রম এতদিন পঞ্চদশ বৎসর। রূপের কথা শুনিয়া কি হইবে?

সন্ন্যা। কিছু হইবে না, কিরূপ রূপ জানিতে পারিলে সই চন্দ্রলেখার সঙ্গে একবার মিলাইয়া দেখিতাম।

কুমার কিছু আশ্বাসিত হইয়া কহিলেন, "চন্দ্রলেখার রূপের পরিচয়! ভিখারিণি! কিরূপে তাহার রূপের পরিচয় দিব, কিরূপেই বা সে রূপ তোমাকে অনুভূত করাইব! যদি বল, তাহার চক্ষুদুটী কেমন, ভিখারিণি! তাহার যুগল লোচন যেন—যেন ঠিক কবি-কল্পিত মধুপানাকাঙ্ক্ষী ভৃঙ্গোপবিষ্ট প্রস্ফুটিত সরস কমলযুগল। না, না, হইল না, কমলের সহিত তুলনা করিতে পারিলাম না, কারণ সে চক্ষুদুটীর মত পদ্মপত্রে ঔজ্জ্বল্যও নাই অথবা প্রণয়ীজনের তত্ত্বাতী মধুরিমাও নাই। দ্বিতীয়তঃ ভ্রমর পদ্মমধু শোষণ করিতে করিতে নলিনীর মধুর শোভা অচিরাৎ নষ্ট করে, কিন্তু পিপাসিত চক্ষে

যতবার তাহার নয়নপানে চাহিতাম, ততই সে চক্ষুদুটীর শোভা বৃদ্ধি পাইত, ততই আমার নেত্র যুগলের পানলালসা বৃদ্ধি করিত। তবে যদি বল, সে চক্ষুদুটী কেমন, ভিখারিণি! সে চক্ষুদুটী ঠিক যেন, যেন—যেন ঠিক সেই, 'মৃগলাঞ্ছন-গঞ্জন-চারুমুখী' চন্দ্রলেখার সেই চক্ষুদুটীর মত!

সন্ন্যাসিনী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে কি মহাশয়! আপনি কি এইরূপে তাহার রূপের পরিচয় দিবেন, তবে আমার সই আপনার সেই চন্দ্রলেখা কিনা কেমন করিয়া বুঝিব।

কুমার বিহ্বল হইয়া কহিলেন, "কেন, কেন, তবে কি আমার চন্দ্রলেখার চক্ষুদুটী আপনার সইএর মত নয়?"

প্রেমিকা প্রেমবিহ্বল কুমারের চক্ষুঃবর্ণন শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, "সই চন্দ্রলেখার সে চক্ষুটীর তুলনা যে তাহারই সেই চক্ষুদুটী, এ কথা মিথ্যা নয়। কহিলেন,—

"চক্ষুদুটী মিলিয়াছে অপরাপর গুলি কিরূপ বলুন।"

কুমার পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সেই সুকেশিনীর আলুলায়িত চিকুরজাল যখন ললিত কপোল আবরিত করিয়া মৃদু মন্দ সমীরণ ভরে আন্দোলিত হইত, তখন বোধ হইত যেন নবীন নীরদে তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে। আবার যখন সেই কেশরাশি সুবিন্যস্ত হইয়া হেম-ভূষণে ভূষিত হইত, তখন বোধ হইত যেন চারুকবরী বিদ্যুচ্ছলে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে।

সেই মনোহর মৌক্তিক-শোভিত সুঠাম নাসিকাগ্রভাগে যখন স্বেদবিন্দুরাজি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিরাজ করিত, তখন

মনে হইত যেন মন্মথের ফুলশরে নিহার বিন্দু পতিত হইয়া মুক্তাকলাপ সদৃশ শোভা পাইতেছে।

আর যখনই তাহার সেই গোলাপ-কুসুম-লোহিতাভ সুকোমল গণ্ডস্থল আমার নয়ন পথে পতিত হইত, মনে হইত যেন—একবার যেন—কি যেন ভিখারিণি! তখন আমার কি যেন মনে হইত।

আর সেই তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত সুধামাখা ওষ্ঠাধর দুটী! যখন তাহাতে মৃদু মধুর হাস্য বিকাশ পাইত এবং সেই স্মিত-মধুর বিম্বাধরে যখন কুন্দবিনিন্দিত শ্রেণীবদ্ধ দশনেন্দু রাজির বিমল-জোতিঃ প্রতিফলিত হইত, তখন বোধ হইত, যেন সুধার সাগরে জ্যোৎস্না সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রেমের লহরী ছুটিতেছে। বল, বল ভিখারিণি! এখন বল দেখি তোমার সই আমার চন্দ্রলেখার মত কিনা?"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন "সই চন্দ্রলেখার রূপরাশি আপনার বর্ণনাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইবে না, তবে কিনা আমি স্ত্রীলোক, যদি পুরুষ হইতাম তবে সে অতুল রূপরাশি বিশেষ রূপে অনুভব করিতে পারিতাম। যদি অনুমতি করেন, সই চন্দ্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কুমার নামে তাহার কেহ পরিচিত আছেন কি না জানিব।"

কুমার কহিলেন "ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমার তাহাতে কোন বাধা নাই।" পরে ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন "তাঁহার কি সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না?"

সন্ন্যাসিনী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "যদি দেখিলে আপনার সংশয় দূর হয়, কৌশলে দেখাইতে পারি। আজ

তবে আসি, কল্য পুনরায় এই স্থানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

সন্ন্যাসিনী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলে কুমার মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রত্নমালা সমীপে গমন করিলেন।

অন্তঃপুরে গিয়া সন্ন্যাসিনী চন্দ্রলেখাকে আদ্যোপান্ত সকল কথা জানাইলেন। কি বলিয়া কুমার তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, তাঁহার মুখে ‘চন্দ্রলেখা’ নাম শুনিয়া কুমার কিরূপ বিস্মিত হইলেন, মুহুর্মুহুঃ তাঁহার মনের ভাব কেমন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, কিরূপে কেমন ভাবে তিনি তাঁহার ‘চন্দ্র-লেখার’ রূপবর্ণন করিলেন, ইত্যাদি সকল কথা সন্ন্যাসিনী চন্দ্র-লেখাকে বলিলেন। তাঁহার মুখে কুমারের নাম শ্রবণ করিয়া চন্দ্রলেখার আশা প্রদীপ বারেক উদ্দীপিত বারেক বা নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিধুরা।

“চিন্তাকুলা শান্তরূপা একাকিনী নীরবে
প্রণয়ের অকাঙ্ক্ষিনী——”

যোগেন্দ্র।

এক্ষণে যামিনী প্রথম যাম অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়ে

পদা ণ করিয়াছে। বাল্যকাল বিগত হইলে কামিনী যেরূপ অভিনব বেশ ফিরাইয়া বসে, অভিনব দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করে, অভিনব কণ্ঠস্বর বাহির করে, অভিনব ও নিরূপম সৌন্দর্য্যের আলোকে জগৎকে আলোকিত, প্রফুল্লিত এবং পরিতৃপ্ত করে যামিনীও সেই বয়সে পা দিয়াছে। শিশু শিশুকে পাইয়া, বালক বালককে পাইয়া যুবক যুবককে পাইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ পূর্ণ যৌবনা যুবতীর সহিত দ্বিপ্রহর রজনীর সাক্ষাৎ হইলে তাহারাও আনন্দিত হয়।

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর আর সেই সন্ধ্যাকালীন প্রথম-বয়স-সুলভ কোলাহল-চাঞ্চল্য নাই, প্রিয়-সখী নিদ্রার সহিত শৈশব সুলভ কলহও নাই, এক্ষণে স্থির হইয়া বসিয়া সখীর সহিত বিশ্রস্ত আলাপ করিতেছে। নীল-নভস্তলে পুণ্যাত্মা দেবগণ বসিয়া পৃথিবীতে দুইটী যুবতীর কথা শুনিতেছেন এবং নক্ষত্র দৃষ্টিতে মুচকি হাসিতে হাস্য করিতেছেন। কুলায়ে বসিয়া পাপিয়া এক একবার জাগিয়া উঠিয়া যেমন ঐ যুবতীদ্বয়ের প্রতি তাকাইতেছে, অমনি নিদ্রাসহচরীর প্রখর চক্ষুঃ তাহার দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় পক্ষীটী চোখ্ ফিরাইয়া কাতর স্বরে বলিতেছে “চোখ গেল!” পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না ফুটাইয়াছে, যেন নিশীথ সময় দিনমান বোধ হইতেছে; দিনমান মনে করিয়া পিকবর আধোঘুম চোখে এক একবার কুহু কুহু রব করিয়া উঠিতেছে। পিকবরের কুহুধ্বনিতে একটী পঞ্চদশ-বর্ষীয়া কুমারী প্রত্যূষ হইয়াছে মনে করিয়া জাগিয়া উ[illegible]; উঠিয়াই পাপিয়ার “চোখ গেল” শব্দে একবার চমকিতা হইল; পরক্ষণেই দেখিল, এখন যামিনী দ্বিপ্রহর। জগৎ

নিস্তব্ধ কেবল চারিদিকে সাঁই সাঁই শব্দ হইতেছে। গবাক্ষোপরি চাঁদের আলোক পতিত হইয়াছে।

কুমারী গবাক্ষে চাঁদের আলোকে আসিয়া গণ্ডদেশে বামহস্ত আরোপিত করিয়া বসিল। প্রিয় সহচরী চিন্তা আসিয়া কুমারীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল "সখি! মৌনভাবে আসিয়া বসিলে যে?" কুমারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনে মনে কহিল, "মরণ আর কি! চোখ্ গেল আর চোখ্ গেল! যাবে না? খুব যাবে। দুটী চক্ষু অন্ধ হবে। পোড়ারমুখো কোকিল! তুমিও দুটী চক্ষের মাথা খাও; যম কি তোমাকে ভুলে আছে? মুখে আগুণ, কেবল কুহু আর কুহু!"

কোকিল কুহু কুহু রব করিয়া ঘুমাইল।

কুমারী আবার কহিল "কালোমাণিক! নীরব হইলে কেন? কুহুরব করিয়া যদি বিরক্ত হইয়া থাক, একবার "কুমার! কুমার!" বলিয়া ডাক না? অথবা আমার মাথা খাও, একটী কথা বলিয়া দাও, সই আসিয়া যে কুমারের কথা কহিল, তিনিই কি সেই কুমার? আমার বাল্যকালের খেলিবার সঙ্গী, যৌবনের সহচর, বৃদ্ধাবস্থার অবলম্বন, মুক্তির আশ্রয় কি সেই কুমার? যাঁহার আশায় সকল হারাইয়া এখন বাঁচিয়া আছি, যাঁহার সহাস্য বদন একবার দেখিব বলিয়া জীবন রাখিয়াছি, যাঁহার জন্য প্রাণ হু হু করে, হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, একি সেই কুমার? কিম্বা এ কুমার আমার মত কোন অভাগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কুমারী চাহিয়া দেখিল,

চন্দ্রকিরণ অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়াছে।

বিরহবিধুরা কুমারী উন্মাদিনীর মত চাঁদকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে কহিল, "এত হাসি কিসের চাঁদ? পরিহাস করিতেছ? সময় পাইয়াছ করিবে বৈকি? এত নিকটে আসিলে কেন? সরিয়া যাও—কর সরাইয়া লও? আবার মুচকি মুচকি হাসিতেছ? কলঙ্কি! দূর হও।"

ক্রমে ক্রমে চিন্তার পরিবর্ত্তন হইল। পরিবর্ত্তিত গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া একটী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, "যেন পিকবর কুহরব পরিত্যাগ করিয়া বিরহবিধুরার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কুমারকে অন্তঃপুর মধ্যে ডাকিয়া আনিল। পথশ্রান্ত প্রযুক্ত যেন কুমারের সর্ব্বশরীর হইতে স্বেদবিন্দু ঝরিতেছিল, চন্দ্রলেখা তালবৃন্ত অভাবে অঞ্চলের বাতাস দিয়া তাঁহাকে শীতল করিল। সুস্থির হইলে চন্দ্রলেখা তাঁহার নিকট বসিয়া কত জ্ঞানের কথা শুনিল, কত প্রাণের কথা শুনাইল, হাসিল আবার হাসাইল। কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা অতীত হইলে কুমারী তাঁহাকে আজিকার মত অন্তঃপুর মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিল। সে অনুরোধ কে না রক্ষা করে? কুমার ইতস্তত করিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন।

কাঁদিতে বা হাসিতে কুমারী যেরূপ পটু, রন্ধন কার্য্যে তাদৃশী নহে, তবুও নিজহস্তে পাক করিয়া কুমারকে আহার করাইল। তত সুন্দর না হইলেও তিনি চাঁদ মুখ চাহিয়া তাহাই আহার করিলেন। আহার করিতে করিতে রন্ধনের প্রশংসা করিলেন, চন্দ্রলেখা মনে মনে আহ্লাদে গলিয়া গেল।

তাহার পর কুমারী কুমারের জন্য আপন কক্ষে মনোমত করিয়া একটী শয্যা রচনা করিল। আহার সমাপনান্তে কুমার সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। তাহার পর চন্দ্রলেখাও আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন অভিপ্রায়ে শয্যাপার্শ্বে গেল, শয়নের পূর্ব্বে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মধুমাখা সলজ্জভাবে একবার তাঁহার বদন পানে তাকাইল। চাহিবামাত্র আপন কৌমারাবস্থা মনে পড়িল, তখন অবনত মস্তকে একবারে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। আর একবার উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। তাহার পর? তাহার পর জাগ্রতাবস্থায় কুমারীর সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চিন্তা অন্তর্হিত হইলে কুমারী সন্ন্যাসিনীর পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হতাশে।

"কান্ত-তনু এ কান্ত একান্ত মোর বটে।"

কবিরঞ্জন।

প্রাতঃকাল হইলে সন্ন্যাসিনী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রলেখা মুখপ্রক্ষালন করিয়া হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসিনীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলে সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সই, আজ যে বড় হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে?

চন্দ্রলেখার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, কোন উত্তর দিল না।

সন্ন্যাসিনীও নীরব রহিল।

চন্দ্রলেখা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার রুক্ষকেশের লোল কবরী খুলিয়া দিল।

সন্ন্যাসিনী তবুও কোন কথা কহিলেন না। অগত্যা চন্দ্রলেখা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিয়া কহিল,—

"দেখ সই! তোমার রূপ যেমন, তেমন তোমার বুদ্ধি নাই।"

সন্ন্যা। কিসে জানিলে তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি কম।

চন্দ্র। বুদ্ধি কম তা নয়, তোমার কোন কথা মনে থাকে না।

সন্ন্যাসিনী বিস্ময়সূচক চক্ষে কহিলেন, "কি কথা আমার মনে নাই?"

চন্দ্র। ভাবিয়া দেখ কাল কি বলিয়াছিলে।

সন্ন্যা। কি বলিয়াছি? মনে নাই।

চন্দ্র। সাধে বলি তোমার ভোলামন! আজ যে কোথায় যাবে বলিয়াছিলে, কৈ যাবে না?

সন্ন্যা। কোথায় যাইব বলিয়াছিলাম?

চন্দ্র। আবার সাক্ষাৎ করিব বলিয়া কাল যাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ, তাঁহার নিকটে।

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া কহিলেন, “সেত সন্ধ্যার সময়।”

চন্দ্রলেখা ক্ষীণস্বরে বলিল, “সন্ধ্যা কি এখন হয় নাই।”

সন্ন্যা। এ যে প্রাতঃকাল।

চন্দ্রলেখার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, ভাবিল “তাইত এযে প্রাতঃকাল!” অপ্রতিভ হইয়া বদন অবনত করিল। তৎপরে আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে অবনতমুখে চলিয়া আসিল।

পাঠক! এরূপ কথা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না। রাত্রি জাগরণ করিয়া অল্পক্ষণ নিদ্রার পর জাগ্রত হইলে প্রাতঃকালকে কখন কখন সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত করিয়া বেলা অবসান হইল। তখন সন্ন্যাসিনী নির্দ্দিষ্ট সময় বিবেচনায় চন্দ্রলেখার নিকটে যাইয়া কহিলেন,—

“কি বলিতে হইবে এখন বলিয়া দাও।”

চন্দ্রলেখা কপট কোপে কুপিত হইয়া কহিল, “কাহাকে কি বলিতে হইবে?”

সন্ন্যা। তোমার শ্যামচাঁদকে।

চন্দ্র। আমার কোন কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না, যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করেন, বলিও চন্দ্রলেখা কাহাকেও চেনে না।

সন্ন্যা। কেবল কি ইহাই বলিব, না অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া কুঞ্জের বাহির করিয়া দিব?

চন্দ্রলেখা কোন কথা কহিল না।

সন্ন্যাসিনী আবার কহিলেন “শ্যাম সোহাগিনি! তবে কি যাইব না?”

চন্দ্র। যাওনা কেন? আমি কাহাকেও নিষেধও করিব না, যাইতেও বলিব না।

সন্ন্যা। তবে যাব না?

চন্দ্রলেখার মুখ আরও মলিন হইল, ছল ছল চক্ষে সন্ন্যাসিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

সন্ন্যা। বিলম্ব হইতেছে, হয়ত এতক্ষণ আসিয়াছেন। কি বল, যাই।

চন্দ্রলেখা অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিল "যাও কিন্তু।"

সন্ন্যা। কিন্তু কি?

চন্দ্র। যদি তেমন তেমন বিবেচনা কর, তবে আমার কোন কথা তাঁহার নিকট বলিও না।

"সব বুঝিলো সই" বলিয়া দ্রুতপদে সন্ন্যাসিনী বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন কুমার তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন।

সন্ন্যাসিনী বাহিরে আসিলে চন্দ্রলেখা গুপ্তভাবে গবাক্ষ হইতে 'এই যুবক সেই কুমার বটে কি না' দেখিবার জন্য এক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। অলক্ষিত ভাবে দেখিল— সেই চিত্তোন্মাদী সুঠাম মোহন মাধুরী! সন্ন্যাসিনীকে প্রত্যাগত দেখিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া পুনরায় উপবেশন করিল, যেন কিছুই জানে না।

এদিকে সন্ন্যাসিনী কুমারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে কি নিদ্রা হইয়াছিল?"

কু। যুবক হইয়া কে কোথায় একা নিদ্রা গিয়া থাকে?

সন্ন্যা। আপনি কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন?

কু। যথায় প্রতিদিন থাকি।

সন্ন্যা। সে গৃহে আর কে থাকে?

কু। রত্নমালা নাম্নী একটী রাজপুতকন্যা থাকেন।

সন্ন্যাসিনী বুঝিলেন যে, চন্দ্রলেখার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কহিলেন "তবে কেন।"

কু। তবে কি ভিখারিণি!

সন্ন্যা। তবে আর সইকে দেখিবার বাসনা কেন? মনে করুন যদিই সই আপনার পরিচিত হন, তবে এক হৃদয়ে দুইটীকে কিরূপে স্থান দিবেন।

কু। ভিখারিণি! তুমি অন্যায় আশঙ্কা করিতেছ, এ হৃদয় একমাত্র চন্দ্রলেখার।

সন্ন্যা। যাহাই হউক, যখন প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন যে কোন উপায়ে দেখাতেই হইবে। আজ তবে আসুন এক-দিন সুযোগমত দেখাইব। অধিকক্ষণ এরূপ নির্জ্জন স্থানে আপনার নিকটে থাকিতে আশঙ্কা হইতেছে, কারণ লোকে দেখিলে মন্দ ভাবিবে।

কুমার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসিনী হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

যে কক্ষে বসিয়া চন্দ্রলেখা সন্ন্যাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, সন্ন্যাসিনী সেই কক্ষে মলিন মুখে প্রবেশ করি-লেন। চন্দ্রলেখা স্বয়ং যে কুমারকে দেখিয়াছেন, সে কথা গোপন করিয়া কহিল—

"একি সই! তোমার এ ভাব কেন? তাঁহার কি সাক্ষাৎ পাও নাই?

সন্ন্যাসিনী বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন, "সাক্ষাৎ হই-য়াছে।"

চন্দ্র। সই, তোমার মুখ শুষ্ক বোধ হইতেছে। তিনি কি কোন কথায় তোমার মনে যাতনা দিয়াছেন?

সন্ন্যাসিনী দুঃখিতভাবে কহিলেন, "আমার মনে তিনি কষ্ট দিবেন কেন, তবে এই দুঃখ, এত করিয়াও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

চন্দ্র। কেন, তিনি তোমাকে কি বলিয়াছেন?

সন্ন্যাসিনী সময় পাইয়া প্রেমের খেলা খেলিবার জন্য আসল কথা গোপনে রাখিয়া কহিলেন, "সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ব্যগ্র হইয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।"

চন্দ্র। তুমি কি বলিলে?

সন্ন্যা। তুমি যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলে আমি সেইরূপ বলিলাম।

চন্দ্র। তবু কি বলিলে?

সন্ন্যা। বলিলাম চন্দ্রলেখা কাহাকেও চেনে না। আরও উত্তম মধ্যম দুকথা শুনাইয়া দিলাম।

চন্দ্র। কেন তুমি এরূপ কথা বলিলে?

সন্ন্যা। আমার দোষ কি বল, তুমি যেরূপ বলিতে বলিয়া-ছিলে, আমি ঠিক সেইরূপই বলিয়াছি।

চন্দ্র। তোমার এরূপ কথা শুনিয়া তিনি কি উত্তর দিলেন?

সন্ন্যা। কি আর উত্তর দিবেন, একবার আম্‌তা আম্‌তা করিলেন, তার পর মানে মানে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রলেখা তখন অশ্রুভরা নয়নে কহিল, "যাইবার সময় কিছু কি বলিলেন না?"

সন্ন্যা। আধো কথা না, কেবল বলিলেন "রত্নমালা আমার সুখে থাক্।"

চন্দ্র। রত্নমালা কে?

সন্ন্যা। কেমন করিয়া জানিব রত্নমালা কে, তবে কথার ভাবে বোধ হইল রত্নমালা কুমারের চন্দ্রলেখা।

চন্দ্র। পরিহাস করা সাজে না সই।

সন্ন্যা। তা কেন হবে, রত্নমালা কুমারের কণ্ঠের রত্নমালা।

চন্দ্রলেখা ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, "আর কি তিনি আসিবেন না?"

সন্ন্যা। সে কথা আমাকে বলিয়া যান নাই; আবার তাঁহাকে কেন?

চন্দ্র। আমি একবার স্বয়ং যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

সন্ন্যা। আ মরি! কি আমার ভালবাসা গো, স্বয়ং সাক্ষাতে যাইবেন, লোকে শুনিলে কি বলিবে।

চন্দ্র। বলে বলুক, তবু তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।

সন্ন্যা। সাক্ষাতে কি ফল হইবে?

চন্দ্র। এ জন্মের মত একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইব।

সন্ন্যা। একবার দেখিলে কি পিপাসা মিটিবে, বরং বৃদ্ধি পাইবে।

চন্দ্র। ক্ষতি কি পিপাসাতুরা হইয়া না হয় প্রাণ হারাইব, তবুত একবার দেখিব।

সন্ন্যাসিনী নিরুত্তর।

চন্দ্রলেখা নীরবে থাকিয়া অনেক চিন্তার পর কহিল, "সই! আমার একটী উপকার করিবে?"

সন্ন্যা। কি করিতে হইবে বল।

চন্দ্র। কোনরূপে যদি রত্নমালাকে একবার দেখাইতে পার।

সন্ন্যা। তাহাকে দেখিয়া লাভ কি?

চন্দ্র। লাভ না থাকিলে এত করিয়া অনুরোধ করিতাম না। নিশ্চয় জানিও কুমার যখন তাঁহাকে ভালবাসেন, তখন সে রত্নমালা সামান্যা রমণী নহেন, আরও জেন যে রত্নমালা আমার প্রাণের প্রাণ কুমার চাঁদকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিয়াছেন, সেই ভাগ্যবতীর দেবীমূর্ত্তি দর্শনে আমার চরিতার্থ লাভ হইবে।

সন্ন্যাসিনী বিস্মিতভাবে চন্দ্রলেখাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, এ সে চন্দ্রলেখা নয়। তাহার সে বাল্যভাব, সে বদনলাবণ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে চক্ষের সে উজ্জ্বলতা তিরোহিত হইয়াছে, দেখিলেন যেন, চন্দ্রলেখা সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি!

মুহূর্ত্তমধ্যে দেবীমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল—চন্দ্রলেখা স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০ஃ০—

ভগ্ন হৃদয়।

"একাকিনী বসি দেবী প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন——"

মেঘনাদবধ।

দিবাকরের করজাল পশ্চিম সাগরে ডুবিয়া গেল। রক্তিম-রাগে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত দেখিয়া বোধ হইল, যেন দিগঙ্গনা নলিনীর দুর্ব্বহ বিরহদুঃখে দুঃখিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোমল চক্ষু রক্তিম করিয়াছে। ক্ষীণান্ধকার বিরহিনী-হৃদয়ে অসহ্য বিরহানলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। একাকিনী মৃগনয়নী কে ঐ রমণী অধোবদনী হইয়া মনোমোহন নয়ন কমল অশ্রুজলে ভাসাইতেছে? মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্যের ভীষণ তরঙ্গের ন্যায় এক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ক্ষীণাঙ্গীর ক্ষীণ তনু চিন্তাকীটে জর জর, শিশির-জর্জ্জরিত কমলিনীর ন্যায় তরুণী মর মর। চিন্তাকুলা বালা চিন্তা করিতেছিল—

"শৈশব হইতে যে রতনে যতনে হৃদয়ে রাখিলাম, যাঁহার জন্য জীবনের সুখ ত্যাগ করিলাম, দুঃখকে দুঃখ বলিলাম না, অনাহারে অনিদ্রায় যাঁহার জন্য পাগলিনী হইলাম, জাগরণে, স্বপনে যে ধনে, মানসনয়নে নিয়তই দেখিতেছি, সে ধনে এত দিনে যদি বঞ্চিত হইতে হইল, এত দিনে আমার

হৃদয়মণি যদি অপরের হইল, তবে অতলজলে ডুবিয়া জীবন ত্যাগ করি না কেন? এত কাল এত দুঃখ সহিয়া যাঁহার জন্য জীবন রাখিলাম, তিনিই যদি অপরের হইলেন, তবে আর এ ছার জীবনে সুখ কি?" অশ্রুবারি দরদরী বহিতে লাগিল— ভূমিতল সিক্ত হইল।

অশ্রুজলে দুকপোল ভাসিয়া যাইতেছে। শ্যামাঙ্গিনীর স্বভাবচঞ্চল ঢল ঢল সেই নয়ন যুগল রক্তিম হইয়াছে। অঙ্গের বসন খসিয়া গিয়াছে। কেশপাশ আলু থালু হইয়া বদন কমলে যেন অলিকুল ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে।

ক্ষণকাল পরে সন্ন্যাসিনী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষীণান্ধকার মিশ্রিত দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রলেখার মুখমণ্ডল মলিন দেখিয়া কহিলেন "সই! আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

সন্ন্যাসিনী নিকটে বসিলেন। চন্দ্রলেখা তাঁহার রুক্ষ চুলের রাশি দুই করে ধারণ করিয়া কহিল "এস সই, আজ তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।"

সন্ন্যা। আজ এ সাধ কেন হইল?"

শুষ্ক মুখে ঈষৎ হাসিয়া চন্দ্রলেখা কহিল "চুলের রাশি বাঁধিয়া দিলে তোমার রূপের রাশি কেমন দেখায়, তাই দেখিব বলিয়া সাধ করিয়াছি।

সন্ন্যা। এ সাধ হইল কেন?

চন্দ্র। আমার সাধ তোমাকে আজ তপস্বিনী বেশে থাকিতে দিব না, চুল বাঁধিয়া দিয়া আমার গহনা গুলি তোমাকে পরাইব। দেখিব এ রূপ দেহ কিরূপ সাজে।

সন্ন্যা। সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, তোমাকে সাজাইতে হইবে কেন, ইচ্ছা ছিল এক দিন স্বয়ং সাজিব।

চন্দ্র। কোন দিন সাজিবে মনে করিয়াছিলে, কবেই বা তাহাতে জলাঞ্জলি দিলে?

সন্ন্যা। যে দিন তোমাকে তাঁহার বামে বসাইয়া সুখে ভাসিতে দেখিতাম, ভাবিয়াছিলাম আমিও সেই দিন সাজিব।

চন্দ্রলেখার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। অবনত বদনে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "সে স্বপ্ন যদি ভাঙ্গিয়াছে, সে কথা আবার কেন?"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "সই তোমার কান্না আর চক্ষে দেখিতে পারি না, তুমি আর কাঁদিও না।"

চন্দ্রলেখা বালিকার মত কহিল "আর কাঁদিব না। কাঁদিব না বলিয়া কি তোমারও নিকট কাঁদিব না?

সন্ন্যা। সে জন্য বলিতেছি না, লোকে দেখিলে বলিবে চন্দ্রলেখা বড় অবোধ।

চন্দ্রলেখা রোদন সম্বরণ করিয়া শুষ্ক মুখে কহিল "সই! পোড়াকপালির জন্য তোমাকে একদিনও সুখী দেখিলাম না। যতদিন না আমি মরি, তুমি কখন সুখী হইতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন "বালাই তুমি কেন মরিবে, শত্রু যে, সে মরুক্।

চন্দ্র। না সই, তুমি বোঝ না, আমার যেন মনে হইতেছে আমি আর বাঁচিব না, আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।

সন্ন্যা। তাইত সই, তোমার মুখের ভাব এমন কেন হইল? আমাকে বল তোমার মনের ভিতর কি হইতেছে?

চন্দ্রলেখার জ্ঞান হইল। কহিল "আজ নয় কাল বলিব।"

এই কথা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "উঠিলে যে।"

চন্দ্র। আমার ঘুম পাইয়াছে।

চন্দ্রলেখা আপন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা-দীপ নির্ব্বাণ।

"প্রিয়ে প্রয়াতে হৃদয়ং প্রয়াতং,
লজ্জাগতা চেতনয়া সহৈব।
নির্লজ্জ রে জীবিত! ন শ্রুতং কিং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

কালিদাস।

চন্দ্রলেখার আশাপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। শুক তারার মত যুবতীর সুখের তারা ডুবিল। সন্ধ্যা অতীত হইলে শয়নকক্ষে শয়ন করিল। হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক দংশন হইতেছিল সুতরাং নিদ্রা আসিল না—শয্যা কণ্টক উপস্থিত হইল। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে মন আকুল হইল। অনেক চিন্তার পর ভাবিল—

"তবে এ দেহধারণে ফল কি? এ কেশ বিন্যাসে প্রয়োজন কি?"

সন্ন্যাসিনীর পূর্ব্বদিনের অদ্ভুত কেশ রচনা বিফল হইল। কবরী প্রথমে ভুজঙ্গিনীশ্রেণী পরে গুচ্ছ গুচ্ছ, অবশেষে আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশ পরিব্যাপ্ত হইল। আবার তখনই মনে হইল,—

"এ দেহ ধারণে ফল কি? তবে এখন কি করি? ভুলিলে হয় না? কাহাকে ভুলিব? কুমারকে! এই মুহূর্ত্তে মাথায় কেন বজ্র পতন হইল না, তাহা হইলে এ দারুণ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইত না। ভুলিতে যদি না পারিলাম তবে বাঁচিয়াই বা কি হইবে? মরিলেত জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না, তবে মরণ কেন হয় না? মরণ কি নিজের হাত নয়? হাত নয় কেন, লোকে যে জলে ডুবিয়া মরে, আমিও কেন জলে ডুবিয়া মরি না? এখানে কি তেমন দ্বারকেশ্বর কিম্বা তেমন কোন সরোবর নাই? যদি থাকে কে আমাকে দেখাইয়া দিবে? নগরের বাহিরে যাই, সরোবর দেখিতে পাইব। আর যদি না মরি, অবোধ মন! বাঁচিয়া তোমার সুখ কি? তুমি কুমারকে ভালবাস যদি কোনরূপে রত্নমালা শুনিতে পায়, কত রাগ করিবে, হয়ত সে জন্য তাঁহাকে কত তিরস্কার করিবে, না জানি কতই ক্ষুব্ধ হইবে! না না, কণ্টক হইয়া থাকিব না। আমার যাহা বাসনা তাহাত পূর্ণ হইয়াছে, তিনিত সুখী হইয়াছেন। তবে আমার মরণে ক্ষতি কি?"

অবোধ বালিকা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উপাধানে মুখ লুকাইয়া নব বিবাহিতা কুলবধূর মত ঠোঁট ফুলাইয়া

ক্ষণকাল কাঁদিল। রত্নমালাকে পাইয়া কুমার যে সুখী হইয়াছেন সেই কথা মনে করিয়া জন্মের মত মধুরাধরে একবার মৃদুহাসি হাসিল। দেখিলে কে না বলিবে সে হাসি নীরস, কে না বলিবে সে হাসি কালমেঘে সৌদামিনী!

তৎপরে সরোবর অন্বেষণার্থ কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া চন্দ্রলেখা নিঃশব্দে বাহির্দ্বারে আসিল, নিঃশব্দে নগর অতিক্রম করিয়া পথে বিপথে চলিল। কোথায় চলিল, কেন চলিল, কে বলিবে? যাইতে যাইতে ভাবিল—

"মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, একবার যদি দেখিয়া মরিতাম, মরণেও সুখ ছিল।"

অবোধ বালিকা বুঝিল না যে, সে মুখ একবার দেখিলে আর কি মরিবার সাধ হইত।

আবার ভাবিল, "একবার যদি এমন সময় রত্নমালার সাক্ষাৎ পাই, তাঁহার পায়ে ধরিয়া একবার দেখাইবার জন্য অনুরোধ করি।"

যে কুসুমকোমল পদযুগল দুর্ব্বাদলের উপরেও চলিতে কষ্ট বোধ করিত, সেই কুশাঙ্কুর-জর্জ্জরিত চরণে চিন্তা করিতে করিতে প্রান্তর অতিক্রম করিল।

রাত্রি যখন গভীর, তখন পূর্ণচন্দ্রালোকে চন্দ্রলেখা অদূরে একটী বন দেখিতে পাইল, মৃত্যুর উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিল। পাঠক! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যে বনের যে দিকে কুমার প্রবেশ করিয়াছিলেন, কুমারী সেই বনের সেইদিকে প্রবেশ করিল। সেই সরোবর নয়ন পথে পতিত হইল, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্রও তাহার

লক্ষ্য হইল না, কারণ জগতের সকল সৌন্দর্য্যই আজ তাহার চক্ষুঃশূল।

অভিলষিত সরোবর দেখিতে পাইয়া চন্দ্রলেখার মন উল্লাসিত হইল। সরোবরে বৃক্ষচ্ছায়া পতিত হইয়াছিল, কাল জলে ক্ষীণান্ধকার পতিত হেতু সরোবর একপ্রকার গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। নক্ষত্রপুঞ্জ উকি মারিয়া জলমধ্য গত আপনাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া রূপের গরবে হাসিতেছিল। সরোবর পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানে অসংখ্য কুসুম কেহবা ফুটিতেছিল, যেন চন্দ্রলেখার সঙ্গে রূপের তুলনা করিবার জন্য রূপ দেখাইতেছিল, কেহ বা পরাজিত হইয়া অভিমানে মুদিতেছিল, কেহ বা ক্রোধে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল, কেহ বা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়া লজ্জায় আর ফুটিল না।

চন্দ্রলেখা সরোবর-তীরস্থিত মহেশ্বর মন্দির দেখিতে পাইল; মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রস্তরে বাঁধান। প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলি অতি সুন্দর রূপে গঠিত। চন্দ্রলেখা সোপানে আরোহণ করিয়া দ্বার সম্মুখস্থিত প্রস্তর-গঠিত প্রাঙ্গণে উপবেশন করিল। চক্ষু মুদিত করিয়া নিবিষ্টচিত্তে মনের সাধে সেই মুখখানি মানসচক্ষে বারংবার দেখিল। কুমারকে উপলক্ষ করিয়া মনে মনে অনেক সুখ দুঃখের কথা কহিল।

মন্দির দ্বার আবদ্ধ ছিল, সহসা উদ্ঘাটিত হইল। মন্দির মধ্য হইতে একটী নবীনা রমণী বহির্গত হইলেন। বহির্দ্দেশে স্ত্রীলোক উপবিষ্টা দেখিয়া নবীনা চমকিতা হইলেন। সাহসে নির্ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

চন্দ্রলেখা আজ ভয়শূন্যা। অসঙ্কুচিত চিত্তে উত্তর দিল "আমাকে চিনিবে না, আমি নিরাশ্রয়া।"

চন্দ্রলেখার বাক্যে নবীনার আশঙ্কা দূরীভূত হইলে কহিলেন, "এত রাত্রে একাকিনী তুমি এখানে বসিয়া কেন?"

চন্দ্র। অনাথিনীর আবার সময় অসময় কি। দেখিলাম স্থানটী অতি নির্জ্জন, সেইজন্য বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি।

নবী। তোমার যেরূপ সুন্দর রূপ তাহাতে এরূপ সময় একাকিনী কি কোথাও আসিতে আছে! মনে কর আমি যদি পুরুষ হইতাম!

চন্দ্র। পুরুষ হইলে বুঝি এখানে বসিতে দিতে না?

নবীনা তাহার সরলতাময় কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, "সুবদনি। তুমি কে? আমি নিত্য দেবদর্শনে আসিয়া থাকি, কখন কোন রমণীকে এরূপ ভাবে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখি নাই।"

চন্দ্র। অনাথিনী কি বলিয়া পরিচয় দিবে জানে না।

নবী। কি বলিলে? অনাথিনী! এসংসারে আপনার বলিতে তবে কি তোমার কেহ নাই? সুখের আকর স্বামী, অভাগিনি! বুঝি সে ধনেও বঞ্চিতা?

চন্দ্রলেখা নীরব।

নবীনা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনমাঝে একাকিনী বসিয়া কি জন্য?"

চন্দ্র। কেন যে বসিয়া আছি, সেকথা অন্তর্য্যামী

জানেন। যদি তুমি রত্নমালা হইতে তবে তোমাকে ইহার কারণ বলিতাম।

নবীনা বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "সুলোচনে! তোমার নাম কি?"

"চন্দ্রলেখা।"

তখন নবীনা আরও চমৎকৃতা হইয়া মনে মনে কহিলেন

"এত সুন্দর যদি না হইবে তবে কুমার নিদ্রাবেশে চন্দ্রলেখা বলিয়া জাগিয়া উঠিবেন কেন? কেনই বা এত অন্যমনাঃ হইবেন? বুঝিয়াছি কিসের জন্য কুমারের তেমন ভাব!"

পাঠক! নবীনা যে রত্নমালা একথা আর বলিতে হইবে না। রত্নমালার প্রফুল্ল বদন আরও প্রফুল্ল হইল, যেন আকাঙ্ক্ষিত পদার্থটী হাতে পাইলেন। কহিলেন "সুহাসিনি! রত্নমালার দেখা পাইলে তাহাকে তোমার মনের কথা বলিও। এখন রাত্রিকালে আমার সঙ্গে চল। যদি বাধা না থাকে, যত দিন ইচ্ছা আমাদের আশ্রয়ে থাকিবে। কোনরূপ কষ্ট হইবে না, চল।"

চন্দ্রলেখা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল "না।"

না কেন পাঠক, বুঝিয়াছেন? গেলে, জলে ডুবিয়া মরিবে কে?

রত্ন। ভগ্নীর মত ভালবাসিব, যত্নে রাখিব। যাইবে না কেন?

চন্দ্রলেখা উত্তর না দিয়া মাথা নাড়িল।

অসম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া রত্নমালা কহিলেন "তবে আর

কি করিব। যদি যাইতে, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। বৃথা আর বিলম্ব করিব না, আমি চলিলাম। ঈশ্বর করুন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি যাপন কর।”

রত্নমালা উঠিলে চন্দ্রলেখা কহিল “তবে কি আর বসিবে না?”

রত্নমালার চরণ চলিল না, আবার বসিলেন। কহিলেন “রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর বসিব না। আমাকে কি তোমার মনে থাকিবে?”

চন্দ্রলেখা সুধাংশু বদনখানি বামদিকে অবনত করিল।

রত্নমালা কহিলেন “হয়ত মনে থাকিবে না, ভুলিয়া যাইবে। দেখ, ভগিনি! কিছু মনে করিও না, স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই রত্নমালাটী গ্রহণ কর।”

এই বলিয়া গলা হইতে রত্নমালা কণ্ঠহার খুলিয়া চন্দ্রলেখাকে পরাইলেন।

চন্দ্রলেখা বিস্মিতা হইয়া কহিল “তা কেন, এ যে বহুমূল্য রত্ন! এ রত্নমালা আমি লইব কেন?”

রত্নমালা মনে মনে কহিলেন “তোমার যে রত্ন, তার কাছে, এ ছার পদার্থ।” প্রকাশ্যে কহিলেন “আমার এমন রত্নমালা আরও আছে। কেহ যদি ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ কাহাকেও কিছু দিয়া সুখী হয়, তাহাকে কি সে সুখে বঞ্চিত করিতে আছে?”

অবোধ বালিকা অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইল।

রত্নমালা আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া কুমারকে সংবাদ দিতে চলিলেন।

রত্নমালা চলিয়া গেলে চন্দ্রলেখা ভাবিতে লাগিল "তাঁহার সঙ্গে বুঝি এ জনমে আর দেখা হইল না!"

তখন শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া শীতল বায়ু চন্দ্রলেখার গাত্র স্নিগ্ধ করিতেছিল। অন্তরে যদিও অগ্নি জ্বলিতেছিল কিন্তু শীতল বায়ু সংলগ্নে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। ক্রমেই শরীর, শীতল হইতে লাগিল। ক্লান্তি প্রযুক্ত তন্দ্রা আসিল। তখন প্রাঙ্গণোপরি বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া তদুপরি সেই নবনীত সুস্নিগ্ধ-তনু ঢালিয়া দিল। অর্দ্ধাবৃতা কলেবরটী একবার দুলিয়া উঠিল। শয়ন করিয়া সেই মুখখানি ধীরে ধীরে চিত্তপটে আঁকিতে লাগিল। স্মৃতিপথে সেই সৌম্যমূর্ত্তি আসিতে দেখিয়া অতৃপ্ত চক্ষুঃ অভিমানে মুদিত হইল।

পাঠক! আমাদের সঙ্গে এখন চলুন। পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী অর্দ্ধাবৃতা কলেবরে নির্জ্জনে নিদ্রিতা হইলেন। এরূপ সময় এস্থানে থাকা উচিত হয় না। আবার না হয় আমাদের সঙ্গে আসিবেন। আপনিও এখন ঘুমের ঘোরে টলমল করিতেছেন। জানেন বোধ হয়, নিদ্রাজনিত শিথিল শরীরে নিদ্রাতুরা, বিশেষে স্খলিত-বসন-বক্ষাঃ যুবতীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকা কত কঠিন!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০৹০—

জনমের মত।

"She never told her love;
But let concealment, like a worm i' the bud,
Feed on her damask cheek: She pined in thought;
And with a green and yellow melancholy,
She sat like Patience on a monument,
Smiling at grief."

SHAKESPEARE.

যৎকালে মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া রত্নমালা ও চন্দ্রলেখা পরস্পরে কথোপকথন করিতেছিলেন তখন গৃহে স্বীয় কক্ষ মধ্যে বসিয়া কুমার আপনার অদৃষ্টের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতেছিল। ইন্দুমতি সহসা প্রফুল্ল বদনে আসিয়া ডাকিল "রাজকুমার!"

কুমার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া কহিলেন "আজ যে দেখিতেছি নূতন সম্ভাষণ! তুমি আসিলে রত্নমালা কোথায়?"

ইন্দু। রত্নমালা একা দেব দর্শনে গিয়াছেন।"

কু। কেন?

ইন্দু। কতকদূর গিয়া আমাকে বলিলেন "জ্যোৎস্না রাত্রি তোমাকে সঙ্গে আসিতে হইবে না।" অগত্যা আমি ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় পথে গোস্বামীর সহিত

সাক্ষাৎ হইল। তিনি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন। যাহা শুনিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হইল।

কুমার উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কি শুনিলে, আমি কি শুনিতে পাই না?"

ইন্দু। বলিবার জন্যই আসিয়াছি। রাজকুমার! আপনি যে রাজা যশোবন্তের পুত্র সে কথা আজ জানিলাম।

কুমার প্রকারান্তরে আপন পরিচয় জানিবার জন্য কৌশলে কহিলেন "গোস্বামী তোমাকে কিরূপ কি পরিচয় দিলেন, বল দেখি শুনি?"

ইন্দু। গোস্বামী কহিলেন,আপনি রাজ্ঞী চন্দ্রাবতীর গর্ভে রাজা যশোবন্তের ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সম্রাট আওরংজেব যখন আপনার পিতাকে কৌশলে বধ করিলেন তখন আপনি নিতান্ত শিশু। পতির মৃত্যু সংবাদে আপনার মাতা অত্যন্ত শোকাকুলা হইলেন। শোক এত প্রবল হইল যে পুত্রস্নেহ সে শোক নিবারণ করিতে পারিল না। বৈধব্য দশা যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইল; শিশু পুত্রকে রাখিয়া ভাগ্যবতী চিতারোহণ করিলেন। এত দেখিয়াও সম্রাটের বিদ্বেষানল নির্ব্বাণ হইল না। অবশেষে আপনার জীবনকোরক উচ্ছেদ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সনাতন গোস্বামীকে আপনার পিতা সাতিশয় মান্য করিতেন। তিনিই আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। শুনিলাম আপনাকে লুকাইয়া রাখেন। কোন্‌স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন সে কথা বলিলেন না। বোধ হয় আপনার মুখে যে বঙ্গদেশের কথা শুনিয়া থাকি, সেইস্থানেই রাখিয়া আসেন। এত দিন এ সকল কথার নাম প্রসঙ্গও জানিতাম

না। রাজকুমার! আজ জানিলাম আপনি রাজা যশোবন্তের পুত্র।

কুমারের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া আসিল।

ইন্দুমতি বুঝিল যে, ইহা আর কিছু নহে, পূর্ব্ব ঘটনাবলীর স্মৃতি চিহ্ন। অন্যরূপ স্বরে কহিল, "যদি এমনই হইল তবে আপনার নিকট আমার একটী নিবেদন আছে।"

কু। কি নিবেদন?

ইন্দু। যদি দাসী-বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য না করেন, তবে বলি।

কু। গ্রহণ-যোগ্য হইলে অগ্রাহ্য হইবে কেন?

ইন্দু। অমৃতে অরুচি না জন্মিলে সে কথা অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে আশঙ্কা এই যে, মারবারাধিপতি যশোবন্ত রাজার পুত্র কি তাহাতে সম্মত হইবেন?

কুমার উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "কি বলিবে, বল।"

ইন্দু। দেখিবেন, যেন আমার এতদিনের আশা তরুটী উন্মূলিত করিবেন না। বলিতেছিলাম 'রত্নমালা' নামটী কি মিষ্ট নয়?

কুমারের হৃদয় মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিল, মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল। কহিলেন "রত্নমালা অতি সুন্দর নাম।"

ইন্দু। কিসে জানিলেন সুন্দর নাম?

কু। শুনিতে মিষ্ট, বলিতে মিষ্ট অর্থটীও অতি সুন্দর। আরও কারণ আছে, রত্ন একে মূল্যবান্, তাহার কতকগুলি একসূত্রে গ্রথিত না হইলে কখনই একটী মালা হয় না। এক-সূত্রে গ্রথিত রত্নরাজিকে অমূল্য বলিলেও বলা যায়। অমূল্য

বলিয়াই বোধ হয় এরূপ মিষ্ট নাম প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না।

ইন্দুমতি তখন প্রফুল্ল মুখে ঈষৎ হাসিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য কহিল "নামটী সুন্দর হইলে কি হইবে, দেখিতে শুনিতে তত বোধ হয় ভাল নয়।"

কু। কেন, কি দোষ? গঠন অতি সুন্দর, বর্ণ অতি চমৎকার, চক্ষুদুটী অতি পরিস্কার, অতি পরিষ্কার আগুল্‌ফলম্বিত চুলের রাশি! সুন্দর নয় কেন? সৌন্দর্য্যের আধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইন্দু। হাজার সুন্দর হউক, তবু রাজকন্যারা যেমন, বোধ হয় তেমন নয়।

কু। আমি কখন রাজকন্যা দেখি নাই। হইতে পারে তাঁহারা রূপসী, তা বলিয়া রত্নমালার সঙ্গে রূপের তুলনায় রাজকন্যাত সামান্য, দেবকন্যাও লজ্জা পায়।

ইন্দু। কে জানে পুরুষ মানুষ যেমন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের কথা সঠিক বলিতে পারে, স্ত্রীলোক তেমন পারে না। মানিলাম, দেখিতে শুনিতে সুন্দর কিন্তু সুন্দর রূপে না গুণে?

কু। রূপ, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য তত প্রয়োজনীয় নয়। যাহার গুণ আছে তাহার সকলই সুন্দর। গুণবতী রমণী যাহাই করে, সকলই সুন্দর দেখায়। রত্নমালার অতুল রূপ, গুণেরও পরিসীমা নাই। পরিসীমা নাই বলিয়াই আমাকে এত যত্ন করে, আমিও সেইজন্য স্নেহ করি।

ইন্দুমতি অন্যমনস্ক ভাবে মুখ ফিরাইয়া কহিল "উত্তম

কথা। ঈশ্বর করুন, তাহার ভালবাসা, আপনার স্নেহ বদ্ধমূল হউক। তার পর—কি কথাটী মনে হইল, ভুলিয়া গেলাম।

কু। মনে করিয়া দেখ।

ইন্দুমতি তখন সহাস্য বদনে কহিল, "বলিতেছিলাম কি তা যদি হইল,—রূপে গুণে রাজকন্যা অপেক্ষা যদি ভাল বোধ হইল, তবে না হয় রত্নমালা স্বর্গীয় রাজা যশোবন্তের পুত্রবধূ হউক না?"

কুমারের হৃদয় মধ্যে আবার বিদ্যুৎ চমকিল। ইন্দুমতির কথায় উল্লাসিত হইতে পারিলেন না বরং লজ্জিত হইলেন। কহিলেন,

"সে কি! রত্নমালাকে আমি স্নেহের ভগিনী জ্ঞানে ভালবাসি। তাও কি সম্ভবে। রত্নমালাকে এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গও বলিও না।"

ইন্দুমতির আশাতরু ভগ্ন হইল। কহিল, "দেখুন! ভাল কথা মনে পড়িল, আমি যখন গোস্বামীর নিকট হইতে আসিতেছিলাম, দেখিলাম বৃক্ষের অন্তরালে একজন সশস্ত্র পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিলাম বুঝি আপনি হইবেন। নিকটে না আসিতে আসিতে লুক্কায়িত হইল। সে কি আপনি না আর কেহ?"

কুমার গম্ভীর ভাবে কহিলেন "তোমরা যাইবার পর আমি ত আর বাহিরে যাই নাই।"

ইন্দুমতি ভয়বিহ্বল চিত্তে কহিল, "তবে সে ব্যক্তি কে?"

কু। তাহার বেশ কিরূপ দেখিলে?

ইন্দু। আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, বোধ হইল পাঠানের বেশ। মস্তকে যেন উষ্ণীষ দেখিলাম।

কুমার বিরক্ত ভাবে কহিলেন "এতক্ষণ আমাকে এ সংবাদ দাও নাই কেন? রত্নমালা বাহিরে আছে, বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ। জানত আজ কাল মোগলেরা রত্নমালার সন্ধানে আসিতেছে।

ইন্দু। রাজকুমার! কি হইবে রত্নমালা যে বাহিরে আছে?

কু। ভয় নাই, তুমি অপেক্ষা কর, আমি যাইয়া রত্ন-মালাকে লইয়া আসিতেছি। কুমার পথে বিপদ আশঙ্কা করিয়া অসি গ্রহণ করিলেন। সজ্জিত হইয়া বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর আসিতে না আসিতে রত্নমালার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রত্নমালা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"তুমি আমাকে একা ভাবিয়া ভয় পাইয়াছ?"

কু। আশঙ্কা হইতেই পারে। ইন্দুমতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে না কেন?

রত্ন। চাঁদনি রাত বলিয়া ইন্দুমতিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

কু। মোগলের যে রূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে একা যাওয়া ভাল হয় নাই। সে যা হউক, তোমার কণ্ঠমালা কোথায়?

কুমারকে মন্দিরে পাঠাইবার উত্তম সুযোগ পাইয়া কপট বিস্ময় দেখাইয়া কহিলেন "ফেলিয়া আসিয়াছি!"

কু। মালা গলায় ছিল ফেলিয়া আসিলে কিরূপে?

রত্ন। কে জানে কেন খুলিয়া প্রাঙ্গণের উপর রাখি-

লাম, আসিবার সময় মনে হইল না। তুমি যাইয়া লইয়া আইস।

কু। তুমি একা গৃহে যাইতে পারিবে?

রত্ন। পারিব।

কুমারকে মন্দিরাভিমুখে যাইতে দেখিয়া রত্নমালা চন্দ্রলেখাকে মনে করিয়া মনের আনন্দে আপনাপনি হাসিয়া উঠিল কিন্তু সে হাস্য বিকাশ হইতে না হইতে অনন্তকালের মুহূর্ত্তের ন্যায়, জলবিন্দুবৎ লাবণ্য সলিলে মিশাইয়া গেল। অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিলেন "চলিলে।"

বহুদূরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অপর সীমা হইতে বংশীর সুললিত ধ্বনিবৎ সে কথা কুমারের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া দেখিলেন রত্নমালা কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি রত্নমালা! কাঁদিতেছ কেন? ভয় হই-তেছে?"

রত্নমালার অশ্রুপ্রবাহ আরও বেগে প্রবাহিত হইল। কথা কহিতে পারিলেন না।

কুমার আবার কহিলেন "তোমার মনে কি হইল বল?"

রত্নমালা অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন "কিছু হয় নাই, তুমি যাও।"

কু। না—বল, কি মনে হইল?

রত্ন। মনে হইল আর যেন তোমাকে দেখিতে পাইব না।

কু। ওটা কেবল ভ্রান্তি মাত্র, সময়ে সময়ে অমন কত কথা মনে হয়, তা বলিয়া উহা সত্য নয়।

রত্ন। সত্য না হউক, এইস্থানে তুমি ক্ষণকাল দাঁড়াও।

তোমাকে পূজা করিব বলিয়া ফুল আনিয়াছি। আমি তোমার চরণ দুটী পূজা করি।"

কুমার বুঝিলেন যে রত্নমালার এটী সাধের বাল্যখেলা। তিনি কোন উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। রত্নমালা তাঁহার পদপ্রান্তে পুষ্প নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুষ্পগুলি নিঃশেষিত হইলে তিনি লজ্জাহীনা যুবতীর মত একবার বিশাল চক্ষুদুটী তাঁহার সহাস্য বদনের উপর স্থির করিলেন। কুমার তাঁহার অভিনব ভাব দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সরোবরের দিকে চলিলেন।

যতক্ষণ কুমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেন, ততক্ষণ রত্নমালা তাঁহার পশ্চাৎ দেশ দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যেমন ফিরিলেন, দেখিলেন সম্মুখে এক বিকটাকার মূর্ত্তি! বেশভূষা দেখিয়া বুঝিলেন যবন সৈন্য। মনে হইল চিৎকার করিয়া কুমারকে ডাকেন, তখনই আবার মনে হইল "চন্দ্রলেখা একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া আছে।"

রত্নমালা রাজপুত কন্যা। সাহসে নির্ভর করিয়া কহিলেন "কে তুমি?"

বীরপুরুষ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন "আমি আর কে, আমি মোগল।"

রত্ন। তুমি কাহার অনুমতিতে কি জন্য যোগ ভূমিতে আসিয়াছ?

যবন ব্যঙ্গস্বরে কহিল "দিল্লীশ্বরের আদেশে আপনাকে লইতে আসিয়াছি। চলুন বাহকেরা অপেক্ষা করিতেছে।"

রত্নমালার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মধুসূদনের নাম স্মরণ

করিয়া কহিলেন "দিল্লীশ্বরকে যাইয়া বল, তিনি স্বয়ং না আসিলে আমি যাইব না।"

যবন হাসিয়া কহিল "সুন্দরি! সে জন্য চিন্তা কি? অল্পকাল পরেই সম্রাটের দর্শন পাইবেন। তাঁহার অঙ্কে বসিয়া সে মুখচন্দ্র দেখিবেন। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? চলুন। আমার অপরাধ লইবেন না, ভৃত্য বলিয়া মনে রাখিবেন।"

রত্ন। তুমি কেন আমার ভৃত্য হইবে?

যব। সম্রাট বলিয়াছেন, আপনাকে প্রধান বেগম করিবেন, আপনার যে রূপ দেখিতেছি, একবার বেগম হইলে, আমিত সামান্য ভৃত্য, সম্রাট স্বয়ং আপনার ভৃত্যের কার্য্য করিবেন।

রত্নমালা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন "তোমার বেশ দেখিলে তোমাকে সামান্য ভৃত্য বলিয়া বোধ হয় না?"

যবন আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিল, "সত্যই অনুমান করিয়াছেন, আমি সামান্য ভৃত্য নহি, আমি দিল্লীশ্বরের— কেবল দিল্লীশ্বরের কেন আজ হইতে আপনারও প্রধান সেনাপতি। অধীনের নাম মীরজুম্লা। বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে সে জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। বেগম হইলে আর কি আপনার এ সুধা বচন অধীনের অদৃষ্টে ঘটিবে? চলুন বিলম্ব করিবেন না। অগ্রসর হউন।

রত্ন। সেনাপতি! তোমার কি কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই। মনে কর আমি যদি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করি।

সেনা। না করিলে দিল্লীশ্বরের অনুমতি মত আপনার

পবিত্র কোমল হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিব। আর যদি কোন রূপ বাধা না দেন, আমার হস্তে আপনার পবিত্র শরীর কলুষিত করিতে শঙ্কিত হই।

অকস্মাৎ একজন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া মীরজুম্লার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা দ্বারা সজোরে আঘাত করিল। মীরজুম্লা ছুরিকাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। রত্নমালা তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

অস্ত্রধারী আস্তে আস্তে বলিলেন "পলাও রত্নমালা! পলাও। আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইও না।"

রত্নমালা সেই কথা শুনিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। অস্ত্রধারী পুরুষ মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

সেনাপতির পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত হইল বটে কিন্তু এরূপ সাংঘাতিক আহত হন নাই, যদ্দ্বারা নিয়োজিত কর্ম্মের বিশেষ কোন ব্যঘাত ঘটিতে পারে।

যে ব্যক্তি সেনাপতিকে ছুরিকাঘাত করিল, সে ব্যক্তি কে? সতীর সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর কি মানবের বেশে আসিয়াছিলেন? না ইহাও অনন্তের অনন্ত কৌশল? আমরা যাহাই অনুমান করি না কেন, রত্নমালা তাঁহার স্বর শুনিয়া চিনিলেন, যে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুকুন্দ দাস।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃঃ০—

ফুল্ল কমলিনী !

"I took it for a fairy vision
Of some gay creatures of the element,
That in the colours of the rainbow live
And play i' th' plighted clouds !!"

MILTON'S COMUS.

এ রাত্রিকালে যোদ্ধ্ববেশে কে তুমি যুবক? একাকী কি সাহসে কাহার আশায় মহেশ্বর মন্দিরের দিকে গমন করিতেছ? আমরা সত্য বলিতেছি, তথায় কোন বীর পুরুষ তোমার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া নাই। আজ তথায় যাইও না। যদি দেব দর্শনের অভিলাষ থাকে আজ দর্শন পাইবে না। মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া একটী নব-যুবতী তথায় নিদ্রিতা আছে। কাহার কথা কে বা শোনে? যুবক মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

পাঠক! আপনি এখন কোথায়? যথায় মুদিত কমলিনীকে নিদ্রাতুরা দেখিয়া আসিয়াছি, পুনরায় আমরা সেই স্থানে যাইতেছি, আসুন যুবকের অনুসরণ করি। আর আপনি আসিবেন কেন? আর কি আপনার সে দিন আছে? দিনমানের কথা বলিতেছি না,—যে দিনমানে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া ঘোমটা-বক্ষে পরস্ত্রীর জলকেলি দেখিতে ভালবাসেন—যে দিনমানে কামিনীর পদ-বলয়-শিঞ্জন শ্রবণে গুরুজনকেও উপেক্ষা

চরিয়া চক্ষু ফিরাইয়া চাহিয়া দেখেন—যে দিনমানে পথ-পার্শ্ববর্ত্তী সুধাধবলিত সৌধের গবাক্ষে নয়ন-মন-তৃপ্তিকর তেমন কিছু দেখিতে পাইলে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাষ পরিত্যাগ করেন, সে দিনমানের কথা বলিতেছিনা। বলিতেছিলাম, আর কি আপনার সে দিন আছে। এখন সাতরাজার ধন এক মাণিক! তাহাতে এখন আবার যুবকবাঞ্ছিত, রজনী দ্বিপ্রহর।

কে এমন নিস্তব্ধ রজনীতে, সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা শয়িতার সমুজ্জ্বল দীপালোক-প্রতিভাত চম্পক অথবা কনক-বর্ণা সুকুমার দেহখানির সুস্নিগ্ধকান্তি! সেই স্বর্ণবলয় শোভিত মৃণালনিন্দিত সুকোমল ভূজবল্লী! মধ্যে মধ্যে অলৌকিক, অকৃত্রিম সুমধুর পঞ্চস্বর গঞ্জিত ভূষণ শিঞ্জন! সেই তেমন শরৎ কালীন সুধাকর বিনিন্দিত মৃদু হাস্য বিভাসিত সলজ্জ চারু মুখখানি! সেই ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত কৃষ্ণতার চঞ্চল নয়নের সুতীক্ষ্ণ অব্যর্থ গুপ্ত সন্ধান! সেই সুধাপরিপূর্ণ ওষ্ঠাধর দুটী! সেই ক্ষণস্থায়ী বিজলী সদৃশ মধুর হাস্য! সেই স্মিত মধুর মুখের সরলতাপূর্ণ সুমধুর বাক্যগুলি! আর সেই মুখকমলস্থ অমিয় মাখা তেমন লোহিতাভ বিম্বাধরে, পাঠক! তেমনি ভাবের অবিতৃপ্ত চুম্বন-লালসা পরিত্যাগ করিয়া এ রাত্রে কোন্ যুবক কুমারের অনুসরণ করিতে বাসনা করেন? অতএব নিরাপদে সে সুখ ভোগ করুন, আমরাই চলিলাম।

যুবক মন্দিরাভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময় অশ্বপদ শব্দ তাঁহার কর্ণ গোচর হইল। ফিরিয়া চাহিলেন কিন্তু বৃক্ষ সমূহের ঘনতা প্রযুক্ত কিছুই নয়নগোচর হইল না, বোধ হইল

যেন কোন অশ্বারোহী বন মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কুমারের মনে হইল "মুকুন্দ বোধ হয় সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।" মনে ভাবিলেন "রত্নমালা আছে, সাক্ষাৎ হইবে, আমি এখনি মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিব।"

অল্পক্ষণ পরেই মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন এক অপূর্ব্ব রমণী প্রাঙ্গণোপরি শয়িতা। রমণী কে? ভাল করিয়া দেখিবার জন্য যেমন নিকটবর্ত্তী হইলেন, চন্দ্রালোকে দেখিলেন রমণী অর্দ্ধাবৃতা। অপ্রতিভ হইয়া কয়েক পদ ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন "রাত্রিকালে অর্দ্ধাবৃতা এ রমণী কে?" জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিল। সন্নিকটে যাইবামাত্র তাঁহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত করিয়া হৃদয় বীণা বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য স্থানটী স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। কেন যে দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলেন। রমণীর কণ্ঠে রত্নমালা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

তিনি তখন স্তম্ভিত হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন মন্দির সম্মুখস্থিত বৃক্ষ পত্রের মধ্যদিয়া চন্দ্র কিরণ আসিয়া চন্দ্রলেখার বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আলোকিত করিয়াছে, যেন চাঁদ কুমুদিনী ভ্রমে আলিঙ্গন মানসে কর প্রসারণ করিয়াছেন। কুমার নিদ্রাভিভূতা চন্দ্রলেখার চিন্তাজনিত ঈষৎ মলিনাভাবৃত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বদন মণ্ডলের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চাকচিক্যশালী ললাট বেষ্টন করিয়া কুন্তলদাম মুখখানির যে অনুপম শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, সে শোভাও দেখিলেন। দেখিলেন

কৃষ্ণভ্রূযুগল তাহার আননাকাশে বিরাজিত; ভ্রূযুগলের নিম্ন-ভাগে অভিমান ভরে মুদিত কমলিনী সদৃশ বিচঞ্চল আঁখিদ্বয় মুদিত হইয়া রহিয়াছে; নাসিকার উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিদুচ্চ ভাবে ক্রম-নিম্নাগত ঈষল্লোহিতাভ চুম্বন-লালসোদ্দীপক সুকোমল গণ্ডস্থল মুখারবিন্দের অঙ্গরাগ করিয়াছে। নাসারন্ধ্র হইতে ঈষদুষ্ণ নিঃশ্বাস বায়ু আসিয়া নাসাগ্রলগ্ন মৌক্তিককে দোলাইতেছে। মৌক্তিকটী নিঃশ্বাষ বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া কোমলাঙ্গীর কোমল ওষ্ঠে আঘাত প্রদান করিতেছ। কুমারের হঠাৎ মনে হইল, চারুগ্রামে বাল্যকালে সেই উদ্যানে এইরূপ চন্দ্রালোকে এই মুখখানি এমনি ভাবে আর একবার যেন দেখিয়াছিলেন। তাহার পর যাহা দেখি-লেন, তাহা তাঁহার অভিনব ও নিরূপম সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল।

পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন, সেই চন্দ্রলেখার আবার অভিনব সৌন্দর্য্য কি? তাহার উত্তর এই যে, তিন বৎসর হইল চন্দ্রলেখার দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সম্প্রতি পঞ্চদশ; সুতরাং কুমার যে অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি? দেখিলেন চন্দ্র-লেখার উরঃস্থলে দুটী মসৃণ ক্রমোন্নত ক্রমসূক্ষ্ম পর্ব্বত। পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে অতি রমনীয় কবিকল্পিত উপত্যকা। যুবক বুঝিলেন যে, এ দুটী সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব সম্পন্ন, বয়োচিত অসম্পূর্ণ পীণ স্তন!

নিদ্রাগতা রূপলাবণ্য সম্পন্না প্রেমময়ীর চাঞ্চল্যবিহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিতে দেখিতে কুমারের মনে নানারূপ

ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার মনে যে তখন কি ভাবের উদয় হইতেছিল, সে কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে এই বলিতে পারি, যদি তখন কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "কুমার! সে অশ্বারোহী কে?" তিনি নিশ্চয়ই উত্তর দিতেন "চন্দ্রলেখা আমার রত্নমালা অপেক্ষাও সুন্দরী!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর।

মিল, প্রিয়ে কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
——চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
——আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী সরমে।

মেঘনাদবধ।

"He left her—when, with heart too full to speak,
He took away her last warm tears upon his cheek."

MOORE.

কুমার ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রলেখার নিকট বসিলেন।

বসিয়া ভাবিলেন "ঈশ্বর আমার জন্যই কি একাধারে এ সৌন্দর্য্য পাঠাইয়াছেন।"

কতক্ষণে সেই আকর্ণ-বিস্তৃত কমললোচন বিকশিত হইবে সে জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তৎপরে বায়ুতাড়িত অলকাগুচ্ছ যেমন স্থানান্তরিত করিতে গেলেন, অমনি তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে চন্দ্রলেখা জাগ্রত হইল। জাগ্রত হইয়াই এক-পার্শ্বে সসস্ত্র পুরুষবর দেখিয়া বালিকা চমকিতা ও ভীতা হইল। তাহাকে ভয় বিহ্বলা দেখিয়া কুমার কহিলেন "ভয় কি চন্দ্রলেখা! আমাকে চিনিতে পার নাই? আমি কুমার।"

চন্দ্রলেখা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া মনে মনে কহিলেন, "তিনিইত বটে! ইহা কি স্বপ্ন না যথার্থ। সত্যই কি বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন? সত্যই কি কুমার আসিয়া চন্দ্রলেখা বলিয়া আহ্বান করিলেন? তা না হইলে এত মিষ্ট স্বর আর কাহার? যদি স্বপ্ন না হয় তবে ছি! ওমা ছি ছি কি লজ্জার কথা, কুমারত আমাকে অর্দ্ধ উলঙ্গ দেখিয়াছেন!"

চন্দ্রলেখা শশব্যস্তে বক্ষোদেশ বসনে আচ্ছাদিত করিয়া সলজ্জভাবে উঠিয়া বসিল। হস্তদ্বারা চক্ষুঃমর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার চাহিল—দেখিল সত্যই কুমার তাহার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া আছেন। চন্দ্রলেখা চক্ষুদুটী বারেক উত্তোলন বারেক ধরাতল পানে রাখিতে লাগিল। উভয়েই পরস্পরের চক্ষুঃ প্রতি চাহিলেন; একবার, দুইবার বহুবার দেখিলেন। বারংবার দেখিয়াও কাহারও পরিতৃপ্তিলাভ হইল না। কাহারও মুখে কথা নাই, কিন্তু চক্ষের দেখার শেষ নাই।

ভাষায় এমন কি কথা আছে যাহাতে তাহাদের মনের কথাটী

প্রকাশ হইতে পারে? তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ নীরব ভাষা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, সেই নীরব ভাষায় তাহারা চক্ষে চক্ষে মনের কথা কহিতে লাগিল। তাহাতেও যখন খেদ মিটিল না, তখন কুমার চন্দ্রলেখার হস্তদ্বয় আপন করে ধারণ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে কহিলেন "চন্দ্রলেখা! আমাকে কি তোমার মনে ছিল?"

কে উত্তর দিবে? প্রেম-বিহ্বলা বালিকার কি তখন জ্ঞান ছিল, সে তখন নিষ্পন্দ নয়নে কেবল তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত চক্ষুদুটীর দিকে চাহিয়া যেন কি অপরূপ পদার্থ দেখিতেছিল। ক্ষণকাল পরে কুমার দক্ষিণ করে চন্দ্রলেখার চিবুক ধরিয়া আবার কহিলেন "আমাকে কখন কি ভাবিতে?"

চন্দ্রলেখা কথার উত্তর দিতে গেল কিন্তু পারিল না। আয়তলোচনদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সাক্ষাতের পূর্ব্বে কুমারকে মনে হইলে ভাবিত,

"যদি কখন একবার তাঁহার দেখা পাই এমন কথা বলিব, ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া এত তিরস্কার করিব।" এখন সে সকল কোথায়? আহ্লাদে, শোকে, দুঃখে, অভিমানে সব একবারে ভুলিয়া গেল। অবশেষে চন্দ্রলেখার আয়তলোচন দ্বয় হইতে আনন্দ, শোক, দুঃখ এবং অভিমান মিশ্রিত অশ্রুপ্রবাহ বক্ষঃদেশ ভাসাইয়া নির্ঝরিণীবৎ পতিত হইতে লাগিল।

কুমার পুনরপি কহিলেন, "কাঁদ কেন? কাঁদিও না।"

পাঠক! যেন মনে থাকে, দক্ষিণ হস্তে তেমনি ভাবে চিবুক ধরাই আছে। চিবুক ধরিলে মস্তক যে ঈষৎ বঙ্কিম ভাবে অবনত হইয়াছিল এখনও সেইরূপ অবনত।

হৃদয়াবেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলে চন্দ্রলেখা সুমধুর স্বরে কহিলেন, "ভাল ছিলে ?"

তিন বৎসর পরে সুমধুর স্বর কুমারের কর্ণে প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল "ভাল ছিলে ?" অমনি দেব মন্দির মধ্যে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি হইল "ভাল ছিলে ?" অর্দ্ধ মুদিত চক্ষে পিকবর বৃক্ষশাখে বসিয়া কুহুরবে যেন জিজ্ঞাসা করিল "ভাল ছিলে ?" নৈশবায়ু মৃদুল হিল্লোলে, সরোবর বারি সুধীর তরঙ্গে ললিতস্বরে কহিল "ভাল ছিলে ?" বৃক্ষপত্র মর মর শব্দে যেন জিজ্ঞাসা করিল "ভাল ছিলে ?" নিদ্রিত কুমুদকামিনী চক্ষু মিলিতে মিলিতে যেন জিজ্ঞাসা করিল "ভাল ছিলে ?"

সেই পূর্ব্ব পরিচিত স্বর যেন আরও সু মধুর বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। পাঠক মহাশয়! এরূপ হইবার কারণ কি বলিতে পারেন ? হয়ত কেহ বলিবেন "কুমার চন্দ্রলেখাকে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে পঞ্চদশ সুতরাং বাল্যকাল বিগত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে স্বর স্বভাবতই মধুর হইয়াছে" কেহ বলিবেন "বহুদিন পরে শ্রবণ করিলে প্রিয়জনের বাক্য অপেক্ষাকৃত মধুর বলিয়া বোধ হয়।" রসিক পাঠক বলিবেন "উঁহুঁ তা নয়! দ্বাদশ বর্ষে চন্দ্রলেখার অধরে যে সুধা সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এই তিন বৎসরে কতই না জানি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। "ভালছিলে" ক্ষুদ্র কথাটী তাহার সেই সুধা পরিপূর্ণ অধর দিয়া বাহির হইল, সুতরাং প্রত্যেক কথার প্রত্যেক অক্ষরে সেই তিন বৎসরের সুধা ক্ষরিল, সেই কারণেই

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুমধুর।” কিম্বা ইহার যদি অপর কোন কারণ থাকে তবে সে আপনি সিদ্ধান্ত করুন। এ সম্বন্ধে আমরা অনেক ভাবিলাম কিন্তু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না।

কুমার সে কথায় উত্তর না দিয়া, প্রগাঢ় চুম্বনে অধর আবরিত করিলেন। সে চুম্বনের তাৎপর্য্য এই যে, এক মুহূর্ত্ত তুমি চক্ষের অন্তরালে থাকিলে যে কুমার পৃথিবী অন্ধকার দেখিত, তাহার আর কুশল কোথায়?

কি দৈব বিড়ম্বনা! এরূপ সময়ে সনাতন গোস্বামী অকস্মাৎ কুমারের পশ্চাতে আসিয়া কহিলেন “এ কি কুমার! এই কি তোর প্রতিজ্ঞা? রাজপুত কুলকলঙ্ক! এই কি তোর বীরত্বের পরিচয়? মূর্খ! এতই যদি মনে ছিল তবে কেন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলি। দেখ দেখি কি সর্ব্বনাশ হইল।

অকস্মাৎ শিঙ্গার শব্দ শ্রুত হইল, তৎসঙ্গে পাঠানের চিৎকার ধ্বনিও কাননে প্রতিধ্বনিত হইল।

চন্দ্রলেখা অবগুণ্ঠন টানিয়া বসিল। কুমার গোস্বামীর আরক্তিম মুখমণ্ডল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

গোস্বামী কুপিত হইয়া কহিলেন, “শিঙ্গার শব্দ শুনিয়া এখন ও দাঁড়াইয়া আছ? শিঙ্গার শব্দেও যাহার রক্ত উষ্ণ না হয় সে রাজপুত নামের অযোগ্য।”

কুমার নীরব।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া গোস্বামী স্থিরভাবে কহিলেন “তোমার বক্তব্য যাহা আছে বুঝিয়াছি। আমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি। তুমি এখন যাও, বোধ হয় এতক্ষণ সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকিবে।

চন্দ্রলেখাকে কিরূপে এ বিপদের সময় একা রাখিয়া যাই-বেন ইহাই তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল, সেইজন্য তিনি নীরব ছিলেন।

আবার শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। তখন কুমার মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আট্টালিকাভিমুখে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন। প্রাণের চন্দ্রলেখা তখন আর নয়ন গোচর হইল না। বালিকার কুসুমকলিকা-ঙ্গুলি হইতে ছিন্ন কুসুমের মত কে যেন কুমারকে কাড়িয়া লইল।

সাক্ষাতের পূর্ব্বে তাঁহাকে মনে হইলে, যে সকল কথা বলিবে মনে করিত তাহার কিছুই বলা হইল না। সন্ন্যা-সিনীর মুখে তাঁহার নাম শুনিয়া অবধি কিরূপে দিন গত হইয়াছে, তিন বৎসর কুমার কোথায় কি ভাবে কাটা-ইয়াছেন, একটী কথাও জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কুমার চলিয়া গেলে, গোস্বামী চন্দ্রলেখাকে কহিলেন "এস মা, আমার সঙ্গে চল।"

চন্দ্রলেখা নিরুত্তরে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জ্বলন্ত চিতায়।

"O Horror ! Horror ! Horror ! tongue nor heart
Cannot concieve, nor name thee !"
MACBETH.

কক্ষমধ্যে কে তুমি যুবতী? একাকিনী বিবসনা কে তুমি

সুলোচনে? কেন বারেক হাসিতেছ, বারেক কাঁদিতেছ, বারেক বা শূন্য মনে শূন্য প্রাণে চাহিয়া চারিদিক অবলোকন করিতেছ? তুমিই কি সেই বাল্যকালে আধস্বরে মায়ের মনে স্নেহ সঞ্চার করিতে? তোমারই কি সেই কুসুম-কান্তি বদন-লাবণ্য দেখিয়া পিতামাতার মনে একদিন আনন্দ সঞ্চার হইয়াছিল? হাত বাড়াইয়া তুমিই কি আকাশের চাঁদ ধরিতে যাইতে? চাঁদের আলো, নক্ষত্রের ঝিকিমিকি, ফুটন্ত ফুল, ধাবিত মেঘ, জলের কল্লোল, বিহঙ্গের গান সেই কি তুমি, তুমি কি সেই ভাল বাসিতে? তুমি কি সেই বাল্যকালে প্রাণবঁধু গলে পরাইবে বলিয়া মনের মত মালা গাঁথিতে, কখন বা আপন গাঁথনি আপনি দেখিয়া মুচকি ভাবে মুচকি হাসিতে? যৌবন কালে জলের তরঙ্গে জলতরঙ্গ বাজাইয়া তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যে অঙ্গ, ঠমকে ঠমকে রঙ্গ করিত, সেই কি তোমার এই শিথিলাঙ্গ? আজ তাহার এ ভাব কেন? এ আবার কি? সম্মুখে চিতা! এ চিতায় কি হইবে? চিতায় কি তুমি ঝাঁপ দিবে? ছি ছি এমন কায করিও না! এমন যৌবন, এত রূপ, এত আশা, ভালবাসা, এত প্রাণের হাসি খুসি, হৃদয়ের তেমন উচ্ছ্বাস, তত বিশ্বাস, এত দুঃখেও তত সুখ, আর অতল স্পর্শ প্রেমের সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া অধরে, নয়নে, গণ্ডে, কপোলে, কণ্ঠে, হস্তে, মনে মনে যে সুখ অনুভব করিতে তেমন সুখ জ্বলন্ত চিতায় পোড়াইও না।

পাঠক! দেখ, দেখ, রত্নমালার কোমল করপল্লবে লেখনী কেমন টলিয়া টলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলিতেছে। মনের

কথা গুলি চিত্রে অঙ্কিত হইলে কি রূপ দেখায় তাহাই যেন দেখিতেছেন।

রত্নমালা চিতা সম্মুখে কুমার এবং চন্দ্রলেখাকে পত্র লিখিতেছেন। পত্রদুটীর নানাস্থান অশ্রুজলে সিক্ত হইল; যেমন তেমন করিয়া সমাপ্ত করিলেন।

অকস্মাৎ পাঠানের জয়ধ্বনি হইল—"আল্লা হো আকবর" শব্দে যবনেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে রত্নমালা শিহরিয়া উঠিলেন। ত্রস্ত হইয়া গবাক্ষের নিকট আসিয়া ইন্দুমতিকে সঙ্কেত করিলেন। ইন্দুমতি এতক্ষণ রত্নমালার আদেশমত ছাদ হইতে কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। নিকটে আসিলে রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিলে?"

ইন্দুমতি কহিল, "এখন মোগল সৈন্য অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সত্ত্বরামীণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। মুকুন্দদাসের মত কাহাকে যেন দেখিতে পাইলাম, কুমারকে দেখিতে পাইলাম না, বোধ হয় এখন মন্দির হইতে ফিরিয়া আসেন নাই।"

রত্নমালা কহিলেন, "আমি এই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম তুমি আবার যাইয়া দেখ, তিনি আসিয়াছেন কিনা, যুদ্ধেরই বা কিরূপ হইতেছে।"

ইন্দুমতি আজ্ঞামাত্র যথাস্থানে গিয়া ছাদ হইতে হিন্দু মুসলমানের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ত্রস্ত হইয়া উন্মুক্ত গবাক্ষ বাহিরে রত্নমালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

রত্নমালা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কি দেখিলে?"

ইন্দুমতি ব্যাকুলচিত্তে কহিল "দ্বার খোল।"

রত্নমালা দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইন্দুমতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ করিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল "রত্নমালা! কি হবে? সত্নরামীরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কার সাধ্য আর পাঠানদিগকে রোধ করে। মুহূর্ত্তপরে পাঠান এখনই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবে। কুমারত এ পর্য্যন্ত আসিয়া পোঁছিলেন না।"

রত্নমালা কাতরস্বরে কহিলেন "ইন্দুমতি! তবে আর কেন? বুঝিলাম এ জনমে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, যদি জীবিত থাকিয়া কখন তাঁহার দেখা পাও, বলিও রত্নমালা হাসিতে হাসিতে চিতারোহণ করিয়াছে।"

ইন্দুমতি বিহ্বল চিত্তে কহিল "তুমি না থাকিলে আমি কিরূপে জীবিত থাকিব?"

রত্নমালা তখন অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "দেখ ইন্দু! আর শোকাকুল হইবার সময় নাই। মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন। একখানি জীর্ণ মলিন বসন পরিধান কর। অঞ্চল কোণে এই পত্র দুখানি যত্নের সহিত বাঁধিয়া লও; কুমারের সাক্ষাৎ পাইলে তাঁহাকে দিবে। এখন যাইয়া ছাদের উপর দাঁড়াইয়া থাক, যখন পাঠানেরা তোমাকে দেখিতে পাইবে, তুমি কোনরূপ চিৎকার করিও না। তোমার মলিন বসন দেখিয়া সামান্যা দাসীজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে।"

রত্নমালার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কে যেন রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া কহিল "রত্নমালে! দ্বার খুলিয়া দাও,

শীঘ্র দাও আমি বিপদে পড়িয়াছি, বিলম্ব করিলে পাঠানেরা আমাকে আক্রমণ করিবে।"

রত্নমালা কক্ষমধ্য হইতে কহিলেন "কে তুমি?"

"আমি কুমার।"

কুমারের স্বর রত্নমালার বিশেষ পরিচিত। যিনি উত্তর করিলেন, তিনি মোগল সেনাপতি মীরজুম্লা। ছুরিকাবিদ্ধ হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত অচেতন হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রত্নমালা মীরজুম্লার স্বর শুনিয়াছিলেন, সেই স্বর তাঁহার কর্ণে বাজিল। কহিলেন "বুঝিয়াছি তুমি পাঠান সেনাপতি। বিশ্বাসঘাতক দস্যু! স্বেচ্ছায় রাজপুতকুমারী কাহাকেও দ্বার খুলিয়া দেয় না। যদি ক্ষমতা থাকে, দ্বার ভগ্ন করিতে পার।"

সেনাপতির সঙ্কেত মত অগণ্য মোগল সৈন্য আসিয়া পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিল। মীরজুম্লা হাসিতে হাসিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কেবল মাত্র একটী মলিন বসনা প্রৌঢ়া রমণী মলিন বদনে দণ্ডায়মানা! সেনাপতি ভাবিলেন "রত্নমালা কোথায়?" চিতাগ্নি যেন সেনাপতির মনের কথা বুঝিতে পারিয়া দ্বিগুণ সমুজ্জ্বল হইয়া ঘোর শব্দে অট্টহাস্যে কহিল "আর কোথায়? রত্নমালা আমার ক্রোড়ে অনন্ত শয্যায় শায়িতা। পাঠান! ক্ষমতা থাকেত অগ্নি গর্ভে প্রবেশ করিয়া রত্নমালার পবিত্র দেহ স্পর্শ কর, নতুবা তোদের দিল্লীশ্বরকে যাইয়া সংবাদ দে, কেমন করিয়া নিঃসহায়া রাজপুত রমণী আপন সতীত্ব আপনি রক্ষা করে দেখিয়া যাউক।"

ভারত কামিনীগণ! তোমরাও এস, একবার প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি সমক্ষে দাঁড়াইয়া দেখ, নিঃসহায়া রমণীকে কেমন করিয়া সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে হয়! একবার দেখিয়া যাও রত্নমালার পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইয়া অনন্ত আকাশ মধ্যে কেমন করিয়া অনন্তের সহিত মিশিতেছে! যে স্বর্গীয় সৌরভে রত্নমালা দশদিশ আমোদিত করিতেছে, দেখাও দেখি তোমাদের দেহ হইতে সেই সুগন্ধ প্রবাহিত হয় কি না? স্বামীর অঙ্কে উপবিষ্টা হইয়া যে হাসিভরা মুখখানিতে অন্তর খুলিয়া দিয়া আপন সতীত্বের পরিচয় দাও, অগ্নিগর্ভে পরীক্ষা দিয়া দেখাও দেখি, তোমাদের সেই মুখখানি তেমনি হাসি হাসে কি না? যদি পরীক্ষা স্থানে তেমন হাসি হাসিতে না পার তবে রত্নমালাকে দেখিয়া শিক্ষা কর, সতীনারী কেমন করিয়া অগ্নিগর্ভেও হাসিয়া থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্ফলে।

"Then black despair.
The shadow of a starless night was thrown
Over the world in which I moved alone."

SHELLY.

রত্নমালাকে অগ্নিমধ্যে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া মোগল

সেনাপতির সহাস্য বদন গম্ভীর হইল। হতাশনেত্রে ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন "কে আছ ?"

জনৈক সৈন্য সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল "খোদাবন্দ! গোলাম হাজির।"

সেনা। যাও, এই স্ত্রীলোককে আপাততঃ নজরবন্দী করিয়া রাখ। কেহ যেন ইহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করে। আমার অনুমতি ব্যতিত ইহাকে পরিত্যাগ করিও না।

সেনাপতির আদেশ মত সৈনিক ইন্দুমতির করধারণ করিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দুমতি নিরুত্তর হইয়া জীবন্মৃতাবৎ তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সেনাগণ ইন্দুমতিকে দেখিয়া "দেখ রে বেগম যাইতেছে।" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

ইন্দুমতি তাহাদের আনন্দ দেখিয়া মনে মনে কহিল "অধঃপাতে যাও।"

যে সৈনিক পুরুষ ইন্দুমতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে সেনাগণকে ইঙ্গিত দ্বারা সেনাপতির আদেশ জানাইবামাত্র তাহারা সকলে নিরস্ত হইল। কতকদূর অগ্রসর হইলে আর একদল সেনা ঐ রূপ ভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল। ঐ রূপে সৈনিক তাহাদিগকেও নিরস্ত করিল। দলপতি পশ্চাতে ছিলেন, সম্মুখে আসিয়া সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?"

সৈনিক দলপতিকে নাহুর খাঁ বলিয়া চিনিতে পারিল। সেলাম করিয়া কহিল "সেনাপতি মীরজুম্লা ইহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন, সেই জন্য লইয়া যাইতেছি।

নাহুর খাঁ কহিলেন, "আমার আদেশে ইহাকে পরিত্যাগ কর। আমি থাকিতে তোর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই। আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে উপযুক্ত শাস্তি পাইবি।"

সৈনিক নাহুর খাঁর প্রভুত্বের বিষয় অবগত ছিল, অগত্যা ইন্দুমতিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেল। কোমল হস্তধারণে সে, যে সুখ অনুভব করিতেছিল সে সুখ যে, এত অল্পক্ষণ স্থায়ী হইবে তাহা সে জানিত না, জানিলে অন্য দিক দিয়া লইয়া যাইত, মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সৈনিক দুঃখিত মনে চলিয়া গেল।

আমরা পাঠককে দিব্য করিয়া বলিতে পারি যে, সৈনিক ইহজীবনে সে সুখ ভুলিতে পারে নাই। প্রিয়তমার সুমধুর তান লয় বিশিষ্ট পদধ্বনির মত—আজিকার দিনের সহিত তুলনায় সেই এক দিনের মত, কিম্বা প্রথম সংসারের সহধর্ম্মিনীর পবিত্র ভালবাসার মত, সেই করস্পর্শজনিত সুখ সৈনিকের হৃদয়ে স্বপ্নবৎ প্রায়ই যাতায়াত করিত।

সৈনিক চলিয়া গেলে নাহুরখাঁ ইন্দুমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সময় রত্নমালা কোথায় ?"

ইন্দুমতি কাতর স্বরে কহিল "রত্নমালা কি আর আছে ? তিনি ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

নাহুরখাঁ বিস্ময়পূর্ণলোচনে কহিলেন "সে কি !"

ইন্দুমতি আবার কহিল "রত্নমালা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

নাহুরখাঁ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে কহিলেন "ধন্য রাজপুত দুহিতা! জগতে তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হউক। নিঃসহায়া রমণীকে কেমন করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিতে হয়, তুমি আদর্শ হইয়া শিক্ষা দাও।" প্রকাশ্যে কহিলেন "কুমার কি তথায় ছিলেন না?"

"না।"

"কোথায় কুমার?"

ইন্দু। তিনি মহেশ্বর মন্দিরে গিয়াছেন, বোধ হয় এখন ফিরিয়া আসেন নাই।

নাহুরখাঁ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "তবে এস্থানে আর বিলম্ব করিব না, তুমি আমার সঙ্গে নির্ভয়ে আইস।"

নাহুরখাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দুমতি চলিল। অগণিত পাঠান সেনা কোলাহল করিতেছিল, নাহুরখাঁকে দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে পথ ছাড়িয়া দিল। ইন্দুমতি সমভিব্যাহারে তিনি কুমারের সন্ধানে চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

নাহুরখাঁর সঙ্গে ইন্দুমতিকে একাকিনী দেখিয়া কুমার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন "মুকুন্দ! রত্নমালাকে একা শত্রুমাঝে কেন রাখিয়া আসিলে?"

ইন্দুমতি স্ত্রীলোক, পাছে সে কুমারকে সহসা রত্নমালার মৃত্যু সংবাদ দেয় সেইজন্য তিনি পূর্ব্বেই তাহাকে সাবধান

করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে কহিলেন, "সাধ্বী রত্নমালা পলায়ন করিয়াছেন।"

"কোথায় ?"

মু। সে দুর্গম স্থান; সে স্থানে কেহ তাঁহার সন্ধান করিতে পারিবে না, সে জন্য চিন্তা নাই।

কু। না মুকুন্দ! তুমি সত্য করিয়া বল, রত্নমালা কোথায় ?

মু। তুমি সে গুপ্তস্থান কখন দেখ নাই. গোস্বামীর মুখে একদিন আমি সে স্থানের কথা শুনিয়াছিলাম। রত্নমালা সেই স্থানে লুক্কায়িত হইয়াছেন।

এক্ষণে যাহাই হউক রত্নমালা যে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন এ কথায় কুমার আশ্বস্ত হইলেন। কহিলেন, "ইন্দুমতিকে লইয়া চল, আমি আসিতেছি।"

মু। কোথায় যাইবে ?

কু। যুদ্ধক্ষেত্রে।

মু। একা যাইয়া কি করিবে ?

কু। একা নহে, সন্ন্যাসীরা সহায় হইবে।

মু। সন্ন্যাসীরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে. যোগ-ভূমি মোগলের অধিকার হইয়াছে।

কুমার চমকিত হইয়া ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন "তবে একাই যুদ্ধ করিব। পুনরায় যোগভূমি উদ্ধার হইবে।"

মু। অস্থির হইও না। লোকে শুনিলে উপহাস করি[illegible], অসংখ্য সৈন্যের সহিত একার যুদ্ধ সম্ভবে না।

কুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কহিলেন "তবে এখন উপায় ?"

মু। উপায় আছে, উপাসনা মন্দিরে যাই চল, সনাতন গোস্বামী যেরূপ পরামর্শ দিবেন সেইরূপ করা যাইবে।

কু। চল তবে।

ইন্দুমতিকে সঙ্গে লইয়া উভয়েই উপাসনা মন্দিরে উপনিত হইলেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনজনেই গোস্বামীকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন তিনি চিন্তামগ্ন ও তন্নিকটে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছে।

কুমার বুঝিলেন, অবগুণ্ঠনবতী চন্দ্রলেখা।

গোস্বামী চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুকুন্দকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন "রত্নমালা কি মোগল হস্তে পতিত হইয়াছে?" কুমার অন্যমনস্কবশতঃ শুনিতে পাইলেন না।

মুকুন্দ উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ লোমাঞ্চিত কলেবরে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মনে মনে কহিলেন "রত্নমালা! স্নেহের রত্নমালা অকালে ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেল। কি পরিতাপ! এত করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। একদিন যে রত্নমালা আমায় বলিয়াছিল "আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমি মোগলের চক্ষে ধুলি দিব।" সে কথা ত মিথ্যা নয়।

তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া মুকুন্দ কহিলেন "আপনি এরূপ সময় অস্থির হইবেন না। এখন পরিত্রাণের উপায় দেখুন।

গোস্বা। স্থানত্যাগ ভিন্ন পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই।

মুকুন্দ চন্দ্রলেখাকে দেখিয়া কহিলেন "বসিয়া ঐ অবগুণ্ঠনবতীটী কে?

কুমার এবং চন্দ্রলেখা সম্বন্ধে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য গোস্বামী সঙ্কেত দ্বারা মুকুন্দকে নির্জ্জনে লইয়া চলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তুমিই কি রত্নমালা?

"ঈষৎ-ক্ষিপ্ত-কটাক্ষা স্মের-মুখী সা নিরীক্ষ্যতাং তন্বী॥"

"বদামি সখি! সে তত্ত্বং কদাচিৎ———— ॥"

সাহিত্যদর্পণ।

সনাতন গোস্বামীর উপাসনা মন্দির। এক পার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী চন্দ্রলেখা অধোমুখী হইয়া উপবিষ্টা।

চন্দ্রলেখার বাম হস্তের চম্পক কলিকাঙ্গুলি ভূমিতলে ও কি লিপি বদ্ধ করিতেছে? যে বিধাতা কোমল তনু কামিনীকুল সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সেই স্নিগ্ধ ললিত লোচনের মধুর বিক্ষেপে চিত্ত বিপ্লব ঢালিয়া দিয়াছেন, তিনি বোধ হয় অবলা বা... কার অদৃষ্ট লিপি লিখিতে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন, অথ... 'কি লিখিতে কি লিখিব, পাছে মনোমত না হইলে অপ্রীতিভাজন হই' এই আশঙ্কায় সে ভার উহারই হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

নতুবা চন্দ্রলেখা ভূমিতলে ও কি লিখিতেছে? বুঝিয়াছি ধীরে ধীরে ক্ষিতিতলে মনোমত করিয়া আপন ভাগ্য লিপিবদ্ধ করিতেছে।

গোস্বামী ও মুকুন্দ স্থানান্তরে গেলে ইন্দুমতি অবগুণ্ঠনবতীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "রাজকুমার! বসিয়া উনি কে?"

কুমার হাসিয়া কহিলেন "দেখ না কে? বোধ হয় চন্দ্র-লেখা।"

ইন্দুমতি আশ্চর্য্য হইল। নিকটে যাইয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিল। দেখিল যাহা তাহাতে কে না বলিবে, শরত সুধাকর সেই স্বর্ণকান্তিতে বিমিশ্রিত! তাহার সেই স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল অথচ কি যেন-কি-ভাব-পূর্ণ চক্ষুপল্লব দেখিয়া কে না বলিবে যে, সেই প্রভাত সমীরণ কম্পিতা ক্ষীণকটি বিশিষ্টা ক্ষীণাঙ্গি! যাহার বিম্বাধরের মৃদুহাস্যে উপাসনা মন্দির হাসিতেছিল, কে না বলিবে যে, সে হাসি আর একদিন কেবল রত্নমালার মুখে শোভা পাইত। সে মুখ দেখিয়া ইন্দুমতির অনন্ত শোকানল কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। ধীরে ধীরে কহিল,

"বড় ঘাম দিয়াছে, ঘোমটা খুলিয়া ফেল। দেখ কে আসিয়াছে।"

ইন্দুমতি যে কুমারকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছে, চন্দ্র-লেখা বুঝিতে পারিল। মৃদুস্বরে কহিল "আমি তোমাকে কখন দেখি নাই, তুমি কে?"

ইন্দু। আমি দাসী।

চন্দ্র। কাহার?

ইন্দু। কুমারের।

চন্দ্র। তুমি কি রত্নমালা?

ইন্দুমতি বিষণ্ন বদনে কহিল, "না, আমি, কুমার এবং রত্নমালা উভয়েরই দাসী।

চন্দ্র। রত্নমালা কোথায়?

ইন্দুমতির বিষণ্ন বদন আরও বিষণ্ন হইল। কহিল "এখন না, এক সময় বলিব" এই বলিয়া সে আবার যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সংকল্পে।

"Let me not to the marriage of true minds
Admit impedements : love is not love
Which alters when it alteration finds."

SHAKESPEARE.

"যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠাপত্যুর্বহুমতা ভব।"

শকুন্তলা।

গোস্বামী মুকুন্দদাসকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কহিলেন "মুকুন্দ! এ সকল ঘটনা যে ঘটিবে, আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তবে যে এতদিন ধরিয়া এত চেষ্টা করিলাম সে কেবল মনকে প্রবোধ দিবার জন্য। আমার একটী কথা শুন দেখি।"

মু। আজ্ঞা করুন।

গো। তোমাকে ইতিপূর্ব্বে এক দিন যে জগচ্চন্দ্রের কথা বলিয়াছিলাম। ঐ অবগুণ্ঠনবতী তাহারই কন্যা। নাম চন্দ্রলেখা।

মুকুন্দের গৃহ হইতে চন্দ্রলেখা চলিয়া আসিলে, সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে বিনয় করিয়া সই চন্দ্রলেখার সন্ধানের জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। যুদ্ধ ব্যাপারে সে কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এখন সেই কথা তাঁহার স্মরণ হইল। নীরবে গোস্বামীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

তিনি পূর্ব্বমত বলিতে লাগিলেন, "চন্দ্রলেখা যে কুমারের পত্নী হইবে আমি বহুদিন তাহা অবগত আছি, তবে মারবারাধিপতি যশোবন্তের পুত্র রাজকুমার হইয়া যে জগচন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। চন্দ্রাবতী অগ্নি প্রবেশ কালে কুমারকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান, সেই অবধি আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করি। রাজকন্যা রত্নমালা কুমারের সহধর্ম্মিনী হইবে ইহাই আমার একান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু বুঝিলাম বিধির উদ্দেশ্য সেরূপ নয়। একমাত্র চন্দ্রলেখাই কুমারের ভাবীপত্নী। তা যদি হইল তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি। আমি পিতা স্বরূপ হইয়া চন্দ্রলেখাকে কুমারের করে সম্প্রদান করি। ইহাতে তোমার মত কি?

মু। গুরুদেব যাহা মনন করিয়াছেন তাহাতে আমার আর মতামত কি। যদি তাহাই হয়, কুমার এবং চন্দ্রলেখা যদি পরস্পর তদ্গত প্রাণ হয়, তবে শুভকার্য্য যাহাতে অচিরে সমাধা হয় ইহা আমারও একান্ত বাসনা।

গো। আর এক কথা, আমি কল্যই কাশীধাম যাত্রা করিব, আর একদণ্ডও এ স্থানে অবস্থান করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

মু। আপনি কাশীবাসী হইলে, আমরা কাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইব? কে আর আমাদিগকে ম্লেচ্ছ হস্ত হইতে রাজপুতের একমাত্র আশা ভরসা রাজপুতানা উদ্ধার করিবার জন্য উপদেশ দিবেন? সনাতন গোস্বামী ভিন্ন আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম কে রক্ষা করিবে?

গো। আমি সেই উদ্দেশেই কিছু দিন কাশীধামে থাকিয়া কাশীনাথের উপাসনা করিব। তুমি আরও কিছুদিন এই ভাবে কালক্ষেপণ কর। সময় পাইলে তাহার বিহিত বিধান করিও। এক্ষণে কুমারকে আমার অভিমত জানাইয়া শীঘ্র আমার নিকট ডাকিয়া আন।

মুকুন্দ আদেশ মত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কুমারকে কাণে কাণে গোস্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তৎসমীপে ডাকিয়া আনিলেন।

গোস্বামী কুমারকে কহিলেন "মুকুন্দের মুখে যাহা শুনিলে তাহাতে তোমার মত কি?"

কু। শুনিলাম আপনি কাশীধাম যাত্রা করিবেন।

গো। না, না তা বলিতেছি না। বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

কুমার লজ্জায় মুখ নামাইলেন।

গো। বৎস! তোমার প্রাণ যে চন্দ্রলেখাগত তাহা আমি জানিতাম, তবে যে কেন যুদ্ধের পূর্ব্বে স্ত্রীঅঙ্গ স্পর্শ

করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, সে কথা বলিয়া তোমার মনে যাতনা দিবার আমার আর ইচ্ছা নাই। বিধির যাহা ইচ্ছা তাহা কে লঙ্ঘণ করিতে পারে? এক্ষণে চল, রাত্রি থাকিতে থাকিতে তোমাদের শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা করি। কারণ কল্য প্রাতেই আমি কাশীধাম যাত্রা করিব।

কুমার নিরুত্তর হইয়া মুকুন্দ এবং গোস্বামী সমভিব্যাহারে পুনরায় উপাসনা মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মনমোহিনী সেই একই ভাবে বসিয়া আছে।

গোস্বামী যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া চন্দ্রলেখাকে কুমারের হস্তে সম্প্রদান করিলেন, সে সকল বিবরণ বিবৃত করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। যাহার ফুল ফুটিয়াছে তিনি সে সকল প্রণালী অবগত আছেন। যদি কাহার অস্ফুটত্ব থাকে তিনি যেন উপন্যাস পাঠ না করেন। তিনি এই মাত্র শুনিয়া রাখুন যে, বিবাহ কালে উভয়েরই হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। সেই নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে জগৎ সংসার যে এক অপূর্ব্ব মায়া জালে আচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হয়, তাহারা তখন বিভোর চিত্তে যেন তাহারই স্বপ্ন দেখে।

প্রভাত হইলে দেখা গেল, মোগল সৈন্য বিফল মনোরথ হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। শূন্য অট্টালিকা পতিত রহিয়াছে।

মুকুন্দ গোস্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া এবং কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসিনীকে বিধির আশ্চর্য্য নির্ব্বন্ধের কথা শুনাইলেন।

গোস্বামী নব দম্পতীকে কহিলেন,"বৎস কুমার! আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা যাবজ্জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপণ কর। যে সূত্রে বদ্ধ হইলে, তাহা দিন দিন দৃঢ় হউক। বৎসে চন্দ্র-লেখা! বাছা অক্ষয় সিন্দুরে শোভিতা হইয়া পতিব্রতা রমণীর আদর্শ স্বরূপা হও।"

কু। গুরুদেব! আপনি কি সত্যই আজ কাশীধামে যাত্রা করিবেন?

গো। যাইব বলিয়া তোমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, বেলা অধিক হইতেছে, আর অধিক বিলম্ব করিব না।

কু। আবার কখন সাক্ষাৎ হইবে?

গো। সে জন্য চিন্তা কি? তোমরা চারুগ্রামে যাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর। যখন তোমার নবকুমার হইবে, আমাকে অন্নপ্রাশনের সময় সংবাদ দিও, আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।

কুমার লজ্জিত হইলেন। চন্দ্রলেখা সলজ্জমুখে ইন্দুমতির নিকট চলিয়া গেল। এইরূপ কথোপকথনের পর গোস্বামী বিদায় লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০::০—

আমি যে উন্মাদিনী!

"Love is indestructible.
Its holy flame for ever burneth;
From Heaven it came, to Heaven returneth;"

SOUTHEY.

বিবাহকালে কুমার ইঙ্গিত করিয়া ইন্দুমতিকে রত্নমালার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতি শুভ সময় অশুভ সংবাদ গোপন রাখিয়াছিল। এক্ষণে কুমার পুনর্ব্বার ইন্দুমতিকে ডাকিয়া রত্নমালার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দুমতি মলিন মুখে তাঁহার হস্তে রত্নমালা প্রদত্ত পত্রিকা দুইটী সমর্পণ করিল। কুমার চমকিত হইয়া কহিলেন "ইন্দু! রত্নমালা কোথায়, সত্য করিয়া বল।"

ইন্দু। লিপি পাঠ করুন, জানিতে পারিবেন।

কুমার দেখিলেন তন্মধ্যে একখানি চন্দ্রলেখার নামিত। অপরটী খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। লেখা আছে,—

"কুমার!

দৈববশতঃ তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না, সে জন্য দুঃখিত হইও না। আমাকে রক্ষা করিতে পারিলে না বলিয়া অনুতাপ করিও না, কারণ সে জন্য আমি দুঃখিত নহি বরং সুখী।

আজ আমার শেষ দিন। সম্মুখে চিতা প্রজ্জ্বলিত।

মুহূ পরে অন্তরের জ্বলন্ত চিতা এ চিতায় নির্ব্বাপিত হইবে। জীবন-দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে আর একবার মাত্র তোমাকে দেখিবার বাসনা ছিল, কিন্তু হইল না—দুর্ভাগ্য ক্রমে অন্তিমকালের একমাত্র আশা পুরিল না।

কুমার! আজ মনে পড়িল, এক দিন তুমি আমার বাল্য-কাহিনী শুনিতে সাধ করিয়াছিলে, আমি বলিয়াছিলাম সময় পাইলে বলিব, এখন সেই সময় উপস্থিত। তোমার সাধের কাহিনী আমার বাল্যজীবনী শ্রবণ কর,—

সংসারে সনাতন গোস্বামীই একমাত্র আমার পরিচিত। চিরদিন তাঁহাকে পিতা বলিয়া জানি। তিনিও আমাকে কন্যার মত স্নেহ করেন। একদিন জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার পরিচয় দেন, সেই সুযোগে অন্তরালে থাকিয়া আমার বাল্যকাহিনী শুনি-লাম—শুনিলাম আমার জন্মদাতা জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহ। শৈশবকালে পিতা আমার ছার সৌন্দর্য্য দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন কন্যার রূপ যৌবনে প্রোজ্জ্বল হইয়া মোগলের চক্ষে প্রতিফলিত হইবে। সেই অবধি আমার বাল্যসৌন্দর্য্য পিতার চক্ষের শূল হইল। পিতা হইয়া কন্যার ভাবী সৌন্দর্য্য মানসিক চক্ষে দেখিলেন। যবন হইতে ভবিষ্যৎ বিপদপাতের আশঙ্কা করিয়া নির্দ্দয় হৃদয়ে পিতৃদেব আমার কোমল প্রাণ উচ্ছেদ করিবার বাসনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। সনাতন গোস্বামী পিতার নিকট আমাকে ভিক্ষা চাহিলেন। ব্রাহ্মণ বাক্য লঙ্ঘণ করিতে পারিলেন না, পিতা আমাকে ভিক্ষা স্বরূপ সমর্পণ

করিলেন। সেই অবধি গোস্বামীকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছি।

পরে সম্রাট কর্ত্তৃক পিতা জয়সিংহের মৃত্যু হইলে, গোস্বামী আমাকে লইয়া এই যোগভূমিতে সত্বরামী হিন্দুসম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যদি পিতার উদ্দেশ্য সাধিত হইত। তুচ্ছ প্রাণের সহিত যদি এই ছার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইত। তবে আজ এমন ভাবে তোমার নিকট বিদায় লইতে হইত না।

গোস্বামী যখন আমাকে যোগভূমিতে লইয়া আসেন, শুনিলাম তখন আমি নিতান্ত বালিকা। বাল্যাবস্থা অতীত হইলে, একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আশার তরণীতে আরোহণ করিয়া আছি, কামনা সাগরে তরণী আমার ভাসিয়া যাইতেছে। এমন সময় সহসা অদূরে নবীন মেঘ দৃষ্ট হইল। আকুলপ্রাণে কূলে আসিলাম—দেখিলাম মেঘ নহে, মেঘের বরণ শ্যামল বিটপী। রজ্জু অভাবে রত্নমালা খুলিয়া বৃক্ষে যেমন তরণী বাঁধিতে গেলাম, মালা ছিন্ন হইয়া গেল। আমার বাল্যকাহিনীও ফুরাইল।

আপনার বলিতে আমার জগতে যে কেহ ছিল না, তাহা তোমার অবিদিত নাই। যাহাকে আপনার ভাবিয়া মনঃপ্রাণ সঁপিয়াছিলাম. পরে জানিলাম সে অপরের। যদি বল প্রাণের গুপ্ত কথা তোমাকে বলি কেন? কেন বলি তা জানি না। তোমার সরল মন কখন যদি তিলেকের তরে আমার চিত্ত সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকে,কিম্বা করে, জানিও তাহা ভ্রমমাত্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জাকর এমন একটী কথা তোমাকে আজ

শুনাইতেছি, শুনিয়া হয়ত হাসিবে। স্ত্রীলোক হইয়া সন্ন্যাসীদের নিকটে যুদ্ধ কৌশল শিখিয়াছিলাম, সেই আশ্চর্য্য কৌশলে মোগলের চক্ষে ধুলি দিয়া বোধ হয় প্রাণ বাঁচাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার চেষ্টা করিলাম না। কি জানি মোগলহস্তে পতিত হইলে, যদি পিতার আশঙ্কা সত্য হয় অথবা প্রাণ বাঁচিলে যদি কেহ যাতনা পায়, সেইজন্য পলাইলাম না।

যাহার জন্য একদিন তোমাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম, যখন তাহাকে পাইয়া সুখী হইবে, সেই সুখের দিনে, পার যদি কুমার! হতভাগিনীকে একবার মনে করিও, অথবা রত্নমালা বলিয়া জগতে কেহ ছিল কি না, এ প্রশ্ন মনে উদয় হইতে দিও না।

কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া শ্রমযুক্ত কলেবরে যখন তাহার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইবে। মনে কর, যদি তখন কোন সুখের স্বপ্ন দেখ, সেই স্বপ্নে ভ্রমেও কি রত্নমালার নাম মুখে আনিবে? যদি না আন ক্ষতি নাই, কেননা হতভাগিনী ততদূর আশা করে না।

তোমার নিকট আমার আর অন্য প্রার্থনা নাই। তবে এই মাত্র প্রার্থনা, বলিতে লজ্জা করে, কেননা শুনিলে হয়ত তুমি কি মনে করিবে। যদি আবার নারী জন্ম হয়, দাসী বলিয়া মনে রাখিও, ইচ্ছা হইলে চরণে স্থান দিও, নিঃস্বা কাঁদাইয়া এমনি ভাবে আবার বিদায় দিও, তাহা হইলেও সুখী হইব। যদি বল, এ কথা বলি কেন? কেন বলি? আমি যে উন্মাদিনী!

মরিবার সময় কিছু দিয়া যাইতে পারিলাম না, কারণ তোমাকে দিবার মত, আর আমার নিকট কিছুই নাই। যাহা ছিল অনেক দিন দিয়াছি। যদি জিজ্ঞাসা কর, কি দিয়াছ? আপন হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিও, পাইলেও পাইতে পার। যদি না পাও, সে প্রফুল্ল হৃদয়ে আর একটী স্বর্গীয় পদার্থ দেখিবে—দেখিবে হৃদয় আলোকিত করিয়া কে যেন হাসিতেছে! যদি বল সে কে? সে তোমার সেই চন্দ্রলেখা!

তবে আসি কুমার! জন্মের মত চলিলাম, আর দেখা হইবে না। কিছু মনে করিও না।"

কুমার পত্র পাঠ করিয়া বিমর্ষ হইলেন। নির্জ্জনে যাইয়া মনে মনে রত্নমালার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে হো হো করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

চন্দ্রলেখা অন্তরাল হইতে সহসা তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া সঙ্কেত দ্বারা ইন্দুমতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"উনি চক্ষু মুছিতেছেন কেন?"

ইন্দুমতি বুদ্ধিমতী, তথাচ ভঙ্গস্বরে কহিল, "কি জানি কেন, বোধ হয় চোখে কিছু পড়িয়া থাকিবে।

চন্দ্র। তুমি থতমত খাইয়া কথা কহিতেছ। আমার নিকট গোপন করিও না, বল কি হইয়াছে?

ইন্দু। তবে বোধ হয় গোস্বামী কাশীধামে যাত্রা করিলেন, সেই জন্য দুঃখ হইয়াছে। তাই কাঁদিতে কাঁদিতে হয়ত চক্ষু মুছিতেছেন।

সরলা তাহাই সত্য বিবেচনা করিয়া নীরব হইল।

কুমার ইন্দুমতিকে ডাকিয়া কহিলেন "চন্দ্রলেখাকে প্রস্তুত হইতে বল, অদ্যই আমরা চারুগ্রামে যাত্রা করিব। আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে।"

কি চমৎকার পরিবর্ত্তন! আজ যে বালিকাকে তুমি পুনঃ পুনঃ দেখিতেছ, যাহার সহিত মুক্তকণ্ঠে কত কথা কহিতেছ, কাল সে যদি তোমার পত্নী হয়, তুমি আর তাহার কাছে সহসা যাইতে পার না। হয়ত তাহার দেখাই পাও না—যদি দেখা পাও, নিকটে না যাইতে যাইতে, অমনি সে পলক মধ্যে পতঙ্গের মত উড়িয়া পলায়। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তুমি অপরের দ্বারা বলিয়া পাঠাও।

ইন্দুমতি যাইয়া চন্দ্রলেখাকে তাহা জানাইল। চন্দ্রলেখা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রকাশ করিল। এত আহ্লাদ যে সই সন্ন্যাসিনীকে তখন আর মনে পড়িল না। যখন মনে পড়িল, তখন সাক্ষাতের আর উপায় ছিল না কারণ তখন সকলই প্রস্তুত। মনের দুঃখ মনে রহিল, চন্দ্রলেখা স্বামীসহ ইন্দুমতিকে দাসী ভাবে সঙ্গে লইয়া চারুগ্রামে যাত্রা করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃঃ০—

ব্রত কথা।

"মানিনি! আকুল হৃদয় মোর,
মদন-বেদন, সহিতে না পারি,
শরণ লইনু তোর।
*   *   *   *
একর কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা,
তোঁহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥"

বিদ্যাপতি।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, যে দিন মুকুন্দ দস্যু হস্ত হইতে চন্দ্রলেখা ও সন্ন্যাসিনীকে উদ্ধার করেন। সেই দিন তাঁহাকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসিনীর শরীর লোমাঞ্চিত, স্বর মৃদু ও বদন অবনত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার কারণ পাঠককে অবগত করাইতে চাহি।

ঐ যে রমণী একাকিনী একটী কক্ষে বসিয়া অবিন্যস্ত কেশপাশে পৃষ্ঠদেশে এক একটী করিয়া ভুজঙ্গিনী শ্রেণী লম্বিত করিতেছিল, ওটী কে? কেশ সংস্কার সমাধা হইলে মুখচন্দ্রিমা মার্জ্জিত করিলেন এবং তাম্বুল রাগে অধর পল্লব রঞ্জিত করিয়া একবার আবিষ্ট নয়নে ওষ্ঠ চাপনে উল্টাইয়া দেখিলেন। তাহার পর যে যৌবন ত্রয়োদশ বর্ষে আরম্ভ হইয়া ষোড়শ বর্ষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই চারি বৎসরে,

তাহার কিছু ভাবান্তর হইয়াছে কি না, বিশাল লোচনের স্থির দৃষ্টিতে বিংশতি বর্ষীয়া তাহাই দর্পণে একবার দেখিয়া লইলেন। তাঁহার সেই হাব ভাব দেখিয়া কে বলিবে যে রমণী সন্ন্যাসিনী!

কামিনী বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া ধীরে ধীরে আর একটী কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। সেই কক্ষ মধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি একটী পুরুষ শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পাঠকের পরিচিত মুকুন্দ, কামিনী তাঁহার পদতলে উপবেশন করিলেন।

মুকুন্দ সেই লোহিতাধরে তাম্বুল রাগ দেখিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইলেন। হৃষ্ট মনে কহিলেন, "ভিখারিণি! আজ যে তোমার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তোমার সে বেশ, সে রূপ রুক্ষ কেশ আজ কোথায়? বুঝি প্রলয় উপস্থিত করিবার বাসনা করিয়াছ?"

সন্ন্যাসিনী কোন উত্তর দিলেন না, কেবল বিশাল চক্ষু দুটীর বিশাল দৃষ্টি মুকুন্দের নয়নের উপর স্থির করিলেন। তিনি নয়নশরে অধীর হইয়া মিনতি ভাবে কহিলেন,

"ভিখারিণি! তোমার ঐ মোহিনী মূর্ত্তি আর আমাকে দেখাইও না।"

সন্ন্যা। আমি ও তাই ভাবিতেছিলাম। তুমি দেখ কেন? আর দেখিও না, আমিও আর আসিব না। আমি চলিলাম।

সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মু। যদি একান্ত যাও, তবে আর একবার দাঁড়াও, আর একবার তোমার মোহিনী রূপ দেখিয়া লই।

সন্ন্যা। তুমি বড় নিলর্জ্জ, আর আমি তোমার নিকট দাঁড়াইব না।

মু। আমার মাথা খাও, একবার বস, আর একবার ভাল করিয়া দেখি। (অন্য স্বরে কহিলেন) ভিখারিণি! আর ছল করিয়া ভুলাইও না। বল, আর কত দিন পিপাসিত রাখিবে? ব্রত কি সাঙ্গ হইবে না? যদি আমার জীবনের সঙ্গে তোমার এই কঠোর ব্রত সাঙ্গ হয়, তবে বল কবে তুমি আমার অঙ্কশায়িনী হইবে?

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া কহিলেন "ব্রত সাঙ্গ ত আমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে এখনই ব্রত সাঙ্গ করিতে পারি, কিন্তু একটী কার্য্য করিতে হইবে, তুমি কি তা পারিবে?"

মু। কেন না পারিব, কি করিতে হইবে বল।

সন্ন্যা। ব্রত সাঙ্গ করিতে হইলে, পুরুষকে একটী ব্রতকথা শুনাইতে হয়; কেহ যদি নিবিষ্ট মনে সেই ব্রত কথা শোনে তবেই আমার ব্রত সাঙ্গ হয়।

মু। আমি নিবিষ্ট মনে শুনিব, তুমি বল।

সন্ন্যা। শোন বলি।

সন্ন্যাসিনী মুকুন্দকে ব্রত কথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

"একটী ব্রাহ্মণের এক পত্নী এবং এক কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ ভাগীরথী তীরে কুটীর বাঁধিয়া পরিবার লইয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণী অসময়ে পরলোক গত হইলে তিনি একমাত্র শৈশব কন্যাকে যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। কন্যাটী দিন দিন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া দেখিতে

দেখিতে বয়স্থা হইল। জ্ঞান জন্মিলে সে পিতার শুশ্রূষা কার্য্যে নিয়োজিতা হইল।

যখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, সেই সময়ে একদিন তাঁহাদের কুটীর সন্নিহিত স্থানে গভীর রাত্রে মনুষ্যের আর্ত্ত-নাদ শ্রুত হইল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুটীর মধ্যে রাখিয়া শশব্যস্তে একাকী সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একজন বীরপুরুষ রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত। তাঁহার পরিধানে যুদ্ধসাজ, মস্তকে শিরস্ত্রাণ, কটিদেশে তরবারি। যখন ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। জলপাত্র লইয়া কন্যাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। সে জলপাত্র হস্তে পিতার অনুসরণ করিল, এবং মুমূর্ষু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে চক্ষে শীতল বারি সিঞ্চন করিল। তথাচ চৈতন্যলাভ হইল না দেখিয়া তিনি কন্যার সহায়ে কষ্টে সৃষ্টে তাঁহাকে কুটীরে লইয়া আসিলেন।

তিন দিন তাঁহার জ্ঞান ছিল না।

ব্রাহ্মণ শৈশবাবস্থা হইতে কন্যাকে শিক্ষা দিতেন যে, "অতিথি-সৎকার মনুষ্যের পক্ষে একটী মহাব্রত।"

পিতৃ উপদেশ মত বালিকা সর্ব্বদা পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিত।

পীড়িত অজ্ঞান অবস্থায় আপনাপনি কত কি কথা কহিতেন। বালিকা নিকটে বসিয়া একমনে তাহাই শুনিত। "কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অন্যরূপ উত্তর

দিতেন। কত কি স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেন, কখন বা কাঁদিতেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বালিকাও কাঁদিত, পরের দুঃখ দেখিয়া যে কাঁদিতে হয়, এরূপ ভাবিয়া সে কাঁদিত না, কিন্তু তবু কি জানি কেন সে পীড়িতের জন্য কাঁদিত। তিন দিন তাহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না, কেবল পীড়িতের শুশ্রূষা করিত।

যখন তাঁহার জ্ঞানলাভ হইল, তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখিলেন, যেন এক দেবকন্যা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। তিনি তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—

"আমি স্বপ্নে যে দেববালাকে দেখিতাম, তুমি কি সেই সুরবালা? কে আমাকে স্বর্গে আনিল?

বালিকা তখন উল্লাসিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "এ স্বর্গ নয়, আমিও দেবকন্যা নহি, আমি ব্রাহ্মণ কন্যা।"

তিনি বিশ্বাস না করিয়া কহিলেন "না, মিথ্যা কথা, আমি বুঝিয়াছি তুমি কখনই মানবী নও! যদি দেবকন্যা না হও, তবে তুমি কে বল।"

সে কহিল, "মিথ্যা কি বলিতে আছে, মিথ্যা বলিলে পাপ হয়, সত্য বলিতেছি আমি ব্রাহ্মণ কন্যা।"

তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। নীরব হইয়া কেবল বালিকার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল, তিনিও আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখনই সে নিকটে আসিত, তিনি একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন।"

মুকুন্দ ব্রত কথা শুনিতে শুনিতে ব্যগ্রভাবে কহিলেন,

"তা কেন! একদৃষ্টে তিনি বালিকার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন কেন?"

প্রেমিকা উত্তর করিলেন, "কেন যে চাহিয়া থাকিতেন, সে কথা পুরুষে বলিতে পারে। স্ত্রীলোক আমি—আমি তাহার কারণ কিরূপে বলিব? বল দেখি যখনই আমি তোমার নিকটে আসিয়া বসি, তুমি কেন আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাক?"

মুকুন্দ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোক কি পুরুষের দিকে চাহিয়া থাকে না?"

সন্ন্যা। থাকিবে না কেন থাকে, কিন্তু তোমার মত অত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে না।

মুকুন্দ পরাজিত হইয়া কহিলেন, "তার পর কি হইল?"

সন্ন্যা। আর কি হইবে! আমার ব্রত কথা শেষ হইল। তোমার মনের সাধ মনে রহিল। আমি এখন চলিলাম।

মুকুন্দ অধীর হইয়া কহিলেন, "ব্রত যদি সাঙ্গ হইল, তবে কেন তুমি চলিয়া যাইবে?"

প্রেমিকা হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ব্যস্ত হইও না, তার পর বলি শোন। বলিব কি, তোমাকে সকল কথা বলিতে লজ্জা করে।"

"তাঁহারত সেই ভাব। এদিকে পঞ্চদশ বর্ষীয়া কুমারীর তিন দিন ভোজনে, শয়নে, উপবেশনে কিছুতেই সুখ হইল না। কেবল পীড়িতের পদসেবা করিতে পাইলেই সে অনন্ত সুখ উপভোগ করিত। কখন কখন মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা কি যেন কেমন একরূপ হইয়া যাইত—যেন আপনাতে

আর আপনি থাকিত না। তত যে পীড়িত, তন্নিবন্ধন তত যে বিমর্ষ, তবু যেন তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও বদন লাবণ্য দেখিয়া বোধ হয় তাহার অনন্ত হৃদয়াকাশে অনন্ত আশা বিচরণ করিত।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার মুখ যতই হাস্যপূর্ণ হইতে লাগিল, বালিকার মুখ ততই বিমর্ষ হইতে আরম্ভ হইল।

যাঁহার আরোগ্যলাভের প্রত্যাশায় এত পরিশ্রম, এত যত্ন, তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে বালিকা দুঃখিতা হইল। যাঁহার পীড়িত অবস্থা দেখিয়া সে হো হো করিয়া কাঁদিত, তাঁহারই আরোগ্য লাভে একদিন সে নির্জ্জনে যাইয়া কত যে কাঁদিল, কে বলিবে?

মুকুন্দ সন্ন্যাসিনীকে কহিলেন, "সে কি কথা! এ কি বলিতেছ? যাহার জন্য এত, তাহার আরোগ্যলাভে এ আবার কি?"

সন্ন্যা। স্ত্রীলোকের মনের কথা প্রাণের ব্যথা যদি পুরুষে বুঝিতে পারিত, তবে আর সে কাঁদিবে কেন। "সে এই ভাবিয়া কাঁদিত যে, তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন হয়ত একদিন চলিয়া যাইবেন।

মু। তার পর বল।

"ব্রাহ্মণ কুটীরে থাকিতেন না, প্রায়ই ভাগীরথীতীরে উপাসনা করিতেন। একদিন পুরুষবর সেই নিভৃত কুটীরে বসিয়াছিলেন; কুমারী কুটীর দ্বারে একটী বিনাসুতের

মালা গাঁথিতেছিল। মালা গাঁথা হইলে, তিনি তাহাকে নিকটে আসিতে কহিলেন।

কুমারী তখনও ভাল মন্দ বুঝিত না। অম্লানবদনে বিনা-সূত্রগ্রথিত মালা হস্তে তাঁহার নিকটে গেল। তিনি তাহার কোমল হস্ত ধারণ করিয়া একাসনে বসাইলেন। বালিকা সিহরিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল।

পুরুষ জাতি নিলর্জ্জ। তিনি বালিকাকে বলিলেন "কেহ যদি তোমার বর হইতে চাহে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে?"

বালিকা মৌনাবলম্বনে কহিল "না।"

তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "করিবে না কেন?"

সে কহিল "আমি যে দরিদ্র কন্যা, আমাকে কে বিবাহ করিবে।"

তিনি সহাস্য বদনে কহিলেন, "মনে কর আমি। আমাকে কি পসন্দ হয়?"

বালিকা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, কারণ সে তখন সুস্থির চিত্তে একটী সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল—দেখিতে-ছিল, কে যেন তাহাকে অনন্ত সুখময় স্বর্গে তুলিয়া লইতেছে। নিশাশেষের স্বপ্নের মত তাহার সে স্বপ্নও সত্য হইল। দেখিল সত্যই সে যুবকের স্বর্গাদপি সুখময় অঙ্কোপরি উপবিষ্টা, সহসা কে যেন তাহার হস্তস্থিত বনমাল্য যুবক কণ্ঠে পরাইয়া দিল; বালিকা বুঝিয়াও যেন বুঝিতে পারিল না।

বালিকাত আর তখন নিতান্ত বালিকা নহে, সে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বিনয় বচনে কহিল, "আমাকে ক্ষমা

করুন, আমি আপনার যোগ্যা নহি, পতিপদ পূজার আমি কিছুই জানি না।"

তিনি তাহার হস্তধারণ করিয়া সোহাগ করিয়া কহিলেন, "সে জন্য চিন্তা কি, আমি আজ হইতে কখন তোমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিব না।"

এইরূপে সেই নিভৃত কুটীরে কেবল একমাত্র ঈশ্বর সমক্ষে তাহারা পরস্পর মাল্য পরিবর্ত্তন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রত কথা সমাপ্ত।

"হাসি বহুবল্লব আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রসাতল গেল॥
কত সুখ মোড়ি অধর রস লেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥"

বিদ্যাপতি।

"বিবাহ হইয়া গেলে পর একদিন বালিকা তাঁহাকে দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপন পরিচয় জানাইয়া কহিলেন—

"আমি একজন মোগল সেনাপতি। সম্রাট আওরংজেবের

আদেশে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়াছি। বঙ্গে আমার এই প্রথম আগমন। আসিয়া দেখিলাম, আমার সঙ্গে যেরূপ অল্প সংখ্যক সৈন্য তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধ করা দুরূহ ব্যাপার। কল্য যেমন যুদ্ধের দিন, অদ্য আমি রাত্রিকালে একাকী নৌকারোহণে তাহাদের গুপ্তস্থান সন্ধান করিতে বহির্গত হইলাম। নৌকারোহণে যখন জাহ্নবী পারে আসিতেছিলাম, এমন সময় একদল মহারাষ্ট্রীয় সেনা কিরূপে বোধ হয় সন্ধান পাইয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল। নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া পরপারে অর্থাৎ তোমাদের কুটীর সন্নিহিত স্থানে আসিবামাত্র প্রায় দশ পনের জন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা আমাকে আক্রমণ করিল। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, তখন অত্যন্ত অন্ধকার—এমন কি কোলের মানুষ দেখা যায় না। সুতরাং উপায় বিহীন হইয়া অবিরত অস্ত্রাঘাতে শরীর জর্জ্জরিত হইল। আর অধিকক্ষণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলাম। তাহার পর যে কি হইল কিছুই বলিতে পারি না। যদি রাত্রি অন্ধকার না হইত, তবে আর কি বলিব, আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষেধ নতুবা তপেস-তনয়ে!——

এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন,

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "রাত্রি অন্ধকার না হইলে কি হইত?"

তিনি কহিলেন "নতুবা তপেস-তনয়ে!—নতুবা শত মহারাষ্ট্রীয় নাহরখাঁর পদনখেরও সমকক্ষ হইত না।"

এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "ভিখারিণি ! তোমার ব্রত কথা সম্পূর্ণ সত্য, আমিই সেই নাহুরখাঁ !"

সন্ন্যাসিনী তখন হর্ষোৎফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর ! তুমিই আমার সেই অতিথি ! আমিই তোমার সেই জাহ্নবী-তীরবাসিনী তপেস-তনয়া ! তুমি আমাকে এতদিন দেখিয়াও চিনিতে পার নাই, কিন্তু আমি মুহূর্ত্তমধ্যে তোমার এই বদনেন্দু চিনিয়াছিলাম, তবে যে কেন এতদিন পরিচয় দিই নাই, তাহার কারণ এই যে, সই চন্দ্র-লেখা আমার মনের দুঃখে থাকিবে, আমি কিরূপে তোমাকে লইয়া সুখভোগ করিব। যখন মন আমার কেমন কেমন করিয়া উঠিত, তখন গোপনে তোমার শয়ন কক্ষে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইতাম। আজ বলি, আমি সন্ন্যাসিনী বেশে সামান্যা ভিখারিণী নহি, তোমার নিকট প্রগল্‌ভতা দোষে দোষী বলিয়া আমি ব্যভিচারিণী নহি, আমি তোমার স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমের ভিখারিণী। আজ সই চন্দ্রলেখা আমার স্বামী-সুখে সুখী হইয়াছে, স্বামিন ! প্রাণাধিক ! আজ তোমাকে পাইয়া অনন্ত সুখে আমিও সুখী।

মুকুন্দ বাকশূন্য হইয়া মনে মনে কহিলেন, "তাইত, এত ভিখারিণী নয় ! এ আমার সেই তপেস-তনয়াইত বটে ! আমার তপেস-তনয়াকে আমি এতদিন দেখিয়াও চিনিতে পারি নাই, না জানি কত কি মনে করিয়াছে।"

ইত্যবসরে পাঠক ! বুঝিয়া লউন, যিনি সন্ন্যাসিনী, তিনিই ভিখারিণী, তিনিই আজ আবার তপেস-তনয়া।

স্বামীকে লজ্জিত দেখিয়া তপেস-তনয়া কহিলেন, "প্রাণাধিক! চিনিতে পার নাই বলিয়া আমি কখন দুঃখিত হই নাই, সে জন্য লজ্জিত হইও না। ঈশ্বর পুরুষের হস্তে অনেক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন। রমণীর বদন চিন্তা করা তাঁহাদের কার্য্য নহে। আমরা রমণী, পুরুষের চরণ চিন্তা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই, সেইজন্য স্বামীপদ চিন্তাই রমণীর একমাত্র মহাব্রত। এখন আমার ব্রত কথা সমাপ্ত হইল।"

মুকুন্দ আহ্লাদে গদগদ হইয়া তপেস-তনয়াকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বিদ্যুৎবৎ চমকিত হইয়া সরিয়া বসিলেন। কহিলেন,

"প্রাণেশ্বর! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। বুঝিয়াছি তোমার ভালবাসা অসীম, তোমার গুণের তুলনা নাই। যখন তুমি দৌর্ব্বল্যবশতঃ নিদ্রা যাইতে, আমি রাত্রি জাগরণ করিয়া তোমার শুশ্রূষা করিতাম। ক্লান্তিপ্রযুক্ত কখন কখন পদতলে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। জাগ্রত হইলে দেখিতাম, মস্তক আমার উপাধানে সংরক্ষিত। প্রাণাধিক! সে গুণ যে কাহার, আমি কি বুঝিতে পারি নাই। আবার তাও বলি, তত গুণ যাঁর, তাঁর হৃদয়ে যে দয়ার লেশমাত্র নাই, ইহা স্বপ্নের অগোচর। যে দিন আমার কোমলপ্রাণে আঘাত দিয়া চলিয়া আসিলে, সেইদিন—সেইদিন জানিলাম, তোমার হৃদয় পাষাণে বাঁধা।"

মুকুন্দ তপেস-তনয়ার সহাস্য বদন সহসা বিষন্ন হইল দেখিয়া কহিলেন, "সে দোষ আমার নয়। বিধাতা সেরূপ সময় আমার অদৃষ্টে তোমার সহবাস সুখ লেখেন নাই, তাই

পুনরায় সেনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাই অগত্যা তোমাকে ছাড়িয়া পুনরায় সৈন্যদলে মিলিত হইয়াছিলাম।

তপেস। আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিলে না কেন?

মু। তোমাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলাম বলিয়া কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি' সে জন্য আমি তোমার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী। সে দোষ গ্রহণ করিও না।

তপেস। তা যদি করিতাম, তবে আর সন্ন্যাসিনী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতাম না। আজ তোমাকে এমন করিয়া ব্রতকথা শুনাইতাম না। আর একবার দেখিব বলিয়া এ পাপজীবন রাখিয়াছিলাম, নতুবা সেই দিনেই জাহ্নবী জলে ডুবিয়া মরিতাম।

মু। সন্ন্যাসিনী বেশে ভ্রমণ করিতে কেন? তোমার পিতা কোথায়?

তপেস তনয়ার চক্ষে অশ্রু উথলিল। মুছিয়া কহিলেন "তুমি চলিয়া আসিলে কয়েক দিন পরেই পিতা আমার লোকান্তর গমন করিলেন। সেইদিন হইতে আমি নিরাশ্রয়া। পিতৃহীনা অনাথিনীর আশ্রয় যিনি তাঁহাকে তখন মনে পড়িল। তখন ভাবিলাম, কোথায় গেলে তোমার দেখা পাইব। হতাশ হইয়া জাহ্নবীর কুলে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এমন সময় কে যেন কহিলেন, "মা আমার কাঁদিও না।"

বীণাধ্বনিবৎ সে কথা আমার কর্ণে গেল। চাহিয়া দেখিলাম, কেহই নয়নগোচর হইল না। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া

উঠিলাম। আবার কে যেন কহিলেন, "মা আমার কাঁদিও না। যাহার জন্য কাঁদিতেছ, সংসার অন্বেষণ কর, একদিন সাক্ষাৎ পাইবে, কিন্তু সাবধান! সংসার বড় বিষময়, বিষময় সংসারে রমণীর মুখ বড়ই অনর্থকর! অতএব আমার উপদেশ শোন—তোমার এই অলৌকিক রূপ ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া যথেচ্ছা গমন করিও, কেহ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হইবে না।" সে কথা পিতৃকণ্ঠ নিঃসৃত বলিয়া বোধ হইল। যখন চাহিলাম তখন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

আমি কিন্তু সেই উপদেশমত তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলাম। সন্ন্যাসিনী বেশ পরিধান করিয়া, তোমার আশায় বহির্গত হইলাম।

দিবস রাত্রি সমান জ্ঞান ও রৌদ্র বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া,তোমার জন্য কত নগর, কত গ্রাম, কত তীর্থ স্থান যে পর্য্যটন করিয়াছি সে কথা আর কি বলিব। এত করিয়াও যখন তোমার দেখা পাইলাম না, সে দুঃখ অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে বলিবে? তারপর যে অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম সে সকলইত অবগত আছ।"

তপেস তনয়া নীরব হইলেন।

ব্রত কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সামাল সামাল করিতে না করিতে, ঘাট মাঠ পয়মাল করিয়া প্রেমের নদী প্রবাহিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সংযত সন্ন্যাসধর্ম্ম তৃণপত্রের ন্যায় সে তুফানে ভাসিয়া গেল।

তাহাতে হইল কি? তপেস-তনয়া চুম্বক প্রস্তরাকর্ষিত লৌহশলাকার মত আকর্ষিতা হইলেন। তন্নিবন্ধন অঙ্গুলি-

স্পৃষ্ট লজ্জাবতীলতার মত আকুঞ্চিতা হইলেন। অবগুণ্ঠন সময় বুঝিয়া নামিতেছিল, পারিল না, প্রতিকূল বায়ুতে উড়িয়া গেল। তার পর পাঠক! তুমি আর এ উপন্যাস পড়িও না।

তপেস-তনয়ে! কালামুখি! ছি ছি, তোমার মরণ নাই। ভালবাসার মুখে ছাই! তুমি না সন্ন্যাসিনী? তোমার ও অধরে রসের সঞ্চার! এ আবার কি! ছি ছি—ছি মুকুন্দ! তুমিও পাগল? সাধ কার না হয়? কিন্তু তা বলিয়া কি এত অন্যায়! না জিজ্ঞাসা করিয়া—তুমি তপেস-তনয়ার—আহা কর কি মুকুন্দ! এত সাধের হাসিমাখা রাঙ্গা বিম্বাধর!—ছি ছি এমন করিয়া কলঙ্কিত করিলে!!

—o:o—

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—o:o—

সে তুমি না কে?

অবিরল করবাল কম্পনৈঃ
ভ্রূকুটী তর্জ্জন গর্জ্জনৈ র্মুহুঃ।
দদৃশে তব বৈরিনাং মদঃ
সগতঃ ক্বাপি তবেক্ষণে ক্ষণাৎ॥

সাহিত্য দর্পণ।

প্রভাত হইলে সম্রাট নাহুরখাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তপেস-তনয়াকে গৃহে রাখিয়া তিনি বীরোচিত পরিচ্ছদ

পরিধানান্তর অশ্বারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখিলেন, জনতা মধ্যে বিচারাসনে সম্রাট উপবিষ্ট।

তিনি তথায় উপস্থিত, হইবামাত্র, সঙ্কেত মত কয়েক জন বীরপুরুষ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সম্রাটের সম্মুখে লইয়া আসিল। নাহুরখাঁ আপনাকে বন্দী বিবেচনা করিয়া কহিলেন,

"দিল্লীশ্বরের অভিপ্রায় কি ?"

সম্রা। অদ্য তোমার পরীক্ষা।

নাহু। পরীক্ষা কিসের ? বীরত্বের ? শার্দ্দূল সমক্ষে সে পরীক্ষাত একদিন দিয়াছি।

সম্রা। তুমি সত্যবাদী কিনা অদ্য তাহাই জানিব।

নাহুর স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, "নাহুর যে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলে না, দিল্লীশ্বর আজও কি তাহা বিদিত হন নাই। যদি না হইয়া থাকেন, তবে ইচ্ছামত পরীক্ষা লউন।"

আওরংজেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যে মুক্তকণ্ঠে সকলই স্বীকার করিবে, তাহা আমি জানি। তবু আজ জিজ্ঞাসা করিতেছি, মীরজুম্লার পৃষ্ঠদেশে যে ব্যক্তি ছুরিকাঘাত করিয়াছিল, সে তুমি না কে ?"

নাহুরখাঁ সিহরিয়া উঠিলেন। নির্ভয় চিত্তে কহিলেন, "আপনার অনুমান সত্য, আমিই সেই।"

সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "এরূপ আচরণে তোমার প্রবৃত্তি জন্মিল কেন ?"

নাহু। নতুবা রাজপুত তনয়ার সতীত্ব রক্ষা পাইবার অন্যরূপ উপায় ছিল না।

সম্রা। সে আদেশত আমারই

নাহু। এরূপ অন্যায় আদেশের বিরোধী আমি।

সম্রাট সক্রোধে কহিলেন, "কাফের! আমারই দাস হইয়া আমারই অনিষ্ঠ।

নাহুর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কাফের নহি, দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি বলিয়া সম্রাটের দাস নহি। নাহুর একমাত্র যশোবন্তের দাস। সেনাপতি—সেনাপতি ত তচ্ছ কথা, সেরূপ অপরাধে অপরাধী হইলে, নাহুর দিল্লীশ্বরকেও সমুচিত—

সম্রা। সাবধান কাফের! এখনি বিশ্বাষঘাতকতার জন্য সমুচিত দণ্ড পাইবি।

নাহু। রক্তিম চক্ষুকে মুকুন্দ ভয় করে না। বিশ্বাষঘাতক আমি না আওরংজেব, দিল্লীশ্বর তাহা বিচার করুন।

সম্রাটের হৃদয়স্থ জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন "কে আছ, শীঘ্র কাফেরকে বন্দী কর।"

আজ্ঞামাত্র কয়েকজন অস্ত্রধারী তাঁহাকে সাবধানে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

মেষপাল মধ্যে কে কোথায় শার্দ্দূলবিরোধী সিংহকে বেষ্টিত থাকিতে দেখিয়াছে? নাহুরখাঁ ভ্রুক্ষেপ করিলেন না, প্রচণ্ডবেগে অসি বিঘূর্ণিত করিতে করিতে ব্যূহ ভেদ করিলেন এবং একলম্ফে অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে নিজ আবাসে আসিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া নূতন গৃহিনীকে সংক্ষেপে দুর্ঘটনার কথা জানাইলেন। অনন্তর নিজ অশ্বে তপেস-তনয়াকে আরোহণ করাইলেন। অশ্ববেগে চালিত হইয়া নিমেষ মধ্যে দিল্লী হইতে বহির্গত হইল।

সম্রাটের আদেশানুক্রমে যাহারা যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, কেহই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি তাহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। তাহারা প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদ জানাইল।

নাহুর সনাতন গোস্বামীর উদ্দেশে সস্ত্রীক কাশীধাম যাত্রা করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রত্নমালার পত্র।

"শশিন মুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং
জলনিধি মনুরূপং জহ্নু কন্যাবতীর্ণা।"

রঘুবংশ।

আবার সেই চারুগ্রাম। সেই দ্বারকেশ্বর, সেই উপবন, সেই ভালবাসা! নির্ব্বাপিত প্রদীপ আবার প্রজ্বলিত। এস পাঠক! এই স্থানে বিদায় গ্রহণ করি।

এই নিয়মাধীন সংসারে কেহ কখন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং এ উপন্যাস তৃপ্তিজনক হইল না বলিয়া দুঃখিত হইও না। ইহাত নামে মাত্র উপন্যাস, তুমি স্বয়ং যাহার নায়ক, যাহার নায়িকা তোমারই সেই চিরবিনোদিনী পরিণীতা পত্নী, সেই সংসাররূপ উপন্যাসের কোন পরিচ্ছেদে কয় দিন তৃপ্তিলাভ করিয়াছ বল? তাই বলি আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই, এস এই স্থানে বিদায় গ্রহণ করি।

বিদায় কালে জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে রমণী শয়ন কক্ষে এ হেন সুখের নিশায় শয্যোপরি বসিয়া রোদন করিতেছে এবং একপার্শ্বে বসিয়া সুশীলা চক্ষু মুছাইয়া প্রবোধ দিতেছে, উহার কিসের দুঃখ? মনের যে একটী অভিলাষ ছিল, সেটী ত পূর্ণ হইয়াছে, তবে রোদন কি জন্য?

সুশীলা বলিতেছে "সই চন্দ্রলেখা! এত করিয়া বুঝাইলাম তবু আমার কথা শুনিবে না? মা বাপ লইয়া কে কোথায় চিরদিন ঘর করে? মনের দুঃখে থাকিলে তোমার স্বামীর অকল্যাণ হ'বে। এমন করিয়া যদি কেবল কাঁদ আমি আর আসিব না।"

অকল্যাণের কথা শুনিয়া চন্দ্রলেখা অনেক কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া কহিল "সব বুঝি সই, কিন্তু সুখের দিনে আজ যে তাঁহাদের চরণ দর্শন করিতে পাইব না, ইহা স্বপনেও কখন ভাবি নাই।"

সুশীলার কথাই সত্য। সুখের দিনে মা বাপ লইয়া কয় জন ঘর করিতে পায়, যে করে সেই ধন্য, তাহার সুখের সীমা নাই। তাই বলি পাঠক! যদি মা বাপ জীবিত থাকেন, তবে প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের সেবা কর, প্রাণ ভরিয়া ভক্তি কর, প্রাণ ভরিয়া মুখভরা সেই মার বোলে ডাকিয়া লও; নতুবা দুইদিন পরে আর সে বোল বলিতে পাইবে না। কিছু দিন পরে মনে করিবে "আজ যদি আমার মা থাকিত।"

চন্দ্রলেখা শৈশব কাল হইতে মাতৃহীনা, সুতরাং ভক্তি, ভালবাসা সব সেই পিতা এবং পিতামহীর প্রতি সমর্পণ করিয়াছিল। আজ তাঁহারা চন্দ্রলেখাকে জন্মের মত পরিত্যাগ

করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য চন্দ্রলেখা রোদন করিতে-ছিল।

তাহার চমকিত এবং ছম্ ছম্ ভাব দেখিয়া সুশীলা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল কুমার কক্ষাভিমুখে আসিতেছেন। সুতরাং অবনত মুখে "আজ তবে আসি" বলিয়া সুশীলা আপন গৃহে গমন করিল।

কুমার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রলেখা সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। শান্তচিত্তে কহিল "তোমার হাতে ও কি ?"

কু। একখানি লিপি।

চন্দ্র। কে দিয়াছে ?

কুমার কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রলেখাকে রত্নমালা প্রদত্ত লিপি খানি প্রদান করিলেন। চন্দ্রলেখা নীরবে তাহা পাঠ করিতে লাগিল ঃ—

"প্রাণের ভগ্নী চন্দ্রলেখা !

তুমি আমাকে না চিনিতে পার, আমি কিন্তু কুমারের মুখে তোমার ঐ সুধাময় সুমধুর নাম সহস্রবার শুনিয়াছি। কেবল শুনি নাই ভগিনি! ছার চক্ষে তোমার ভুবন মোহিনী রূপ দেখিয়াছি। বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, যে দিন তুমি মহেশ্বর মন্দিরে কি যেন কি চিন্তা করিতেছিলে, সেই দিন তোমাকে দেখিয়াছি। পরিচয় লইয়া কেন যে আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়াছিলাম, আমি পোড়ামুখী তা জানি না।

বিদায় কালে, যে রত্নমালাটী তোমাকে পরাইয়াছিলাম। যখন কুমারের অঙ্কশায়িনী হইবে, তাহাকে সেটী পরাইও।

আমার গলায় ছিল বলিয়া যদি কুণ্ঠিত হও, যাহা বিবেচনা হয় করিও।

যদি শুনিয়া থাক তিনি আমাকে ভালবাসেন, সে কথা মনে করিয়া দুঃখিত হইও না, কারণ তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি তাঁহাকে ভালবাসী? কেমন করিয়া বলিব, সে কথা সত্য নয়। আমি না বুঝিয়া দুটী চক্ষের মাথা খাইয়াছিলাম; কিন্তু যে দিন শুনিলাম, কুমার তোমার রূপে তোমার গুণে আকৃষ্ট, ঈশ্বর জানেন সেই দিন হইতে ভুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি।

পুরুষ হইলে তোমাকে বুঝাইতে কষ্ট হইত, কিন্তু তুমিও রমণী, রমণী হৃদয়ের ব্যথা তোমাকে জানাইতে হইবে না। যে রূপে যে গুণে তুমি পাগলিনী, বল ভগ্নি! কোন্ রমণী একবার ভালবাসিয়া সে রূপ ভুলিতে পারে? শুনিলে পাছে তুমি মনে কষ্ট পাও, সেই জন্য জ্বলন্ত চিতার পোড়া প্রাণ পোড়াইলাম। চিতার সঙ্গে সকলই নির্বাণ হইল। আজ তুমি নিষ্কণ্টক।

না বুঝিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, সে জন্য ক্ষমা করিও। অন্তিমকালে এই ভিক্ষা, অভাগিনীর গুপ্ত কথাটী তোমার কুমারকে বলিও না, তাহা হইলে মরণেও আমার সুখ হইবে না।

তিনি জাগ্রতে, স্বপনে, অন্যমনে তোমার নাম করিতেন, শুনিয়া কত সুখী হইতাম; কখন বা কাঁদিতেন, তখন বড় কষ্ট হইত। ভাবিতাম যদি কখন তোমার দেখা পাই, তোমার রত্ন তোমার করে সমর্পণ করিয়া সুখী হইব, সেইজন্য কত যত্ন করিতাম। যত্নে রাখিলে তোমাকে ভুলিবেন, এরূপ

আশা কখন করি নাই। আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হইল।

তোমার জন্য কুমারকে সর্ব্বদা অসুখী দেখিতাম। ভাবিতাম যখন তোমাকে পাইয়া সুখী হইবেন, দুই দিন নিকটে থাকিয়া সে সুখ দেখিব; তার পর মরি ক্ষতি কি! কপাল তত জোর নয়, সে অনন্তসুখ আমার ভাগ্যে ঘটিল না, সে সুখ না দেখিয়াই চলিলাম।

চন্দ্রলেখা! ভগ্নি! আমার একটী উপকার করিও। আমার নামে সংকল্প করিয়া দেবীর নিকট এই উদ্দেশে পূজা দিও, যদি আবার নারীজন্ম হয়—ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি আবার নারীজন্ম হয়, তবে যেন পোড়া চক্ষে তেমন রূপ আর কখন না দেখিতে হয়।

আসি তবে—তোমার রত্ন তোমাকে দিয়া জন্মের মত চলিলাম। অযত্নে রত্ন হারাইও না। চক্ষে চক্ষে রাখিও। দেখ ভগ্নি! আর যেন চক্ষের অন্তরাল করিও না।

তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়, তাই আজ আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুখী হও। মাথার সিন্দূর হাতের লুয়া অক্ষয় হউক। আর এক আশীর্ব্বাদ, প্রাণের কুমারকে রাখিয়া আমার মত সাগর জলে বিন্দু যেমন, সংসার সমুদ্রে তেমনি ভাবে বিলীন হইও।"

চন্দ্রলেখা পত্র পাঠ করিয়া বিষন্ন হইল। মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিল। রত্নমালার দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এ কি! পত্র পড়িয়া কাঁদ কেন?"

চন্দ্রলেখা অশ্রু সম্বরণ করিয়া শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে কহিল "তুমি বড় নিষ্ঠুর।"

"কেন চন্দ্রলেখা! কি করিয়াছি?"

চন্দ্র। তুমি বড় কাঁদাও, তোমার দয়া নাই।

কু। কাঁদাইলাম কাহাকে?

চন্দ্র। আমাকে আর—

কু। তোমাকে যে কাঁদাইয়াছিলাম, সে অপরাধ ত পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি, আর কাহাকে?

চন্দ্র। মনে করিয়া দেখ, আর কাহাকে কাঁদাইয়াছ।

কু। আমার কৈ স্মরণ হয় না।

চন্দ্র। রত্নমালাকে।

কুমার অপ্রতিভ হইলেন। রত্নমালার পত্র পাঠ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রত্নমালা নিতান্ত বালিকা, বড় অবোধ চিত্ত বড় কোমল—রত্নমালা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। তাই মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "তুমি পরলোকে সুখী হইবে।" প্রকাশ্যে কহিলেন "কৈ, আমিত রত্নমালাকে কখন কাঁদাই নাই।"

চন্দ্র। না কাঁদাও, তুমি তাহাকে ভালবাসিতে না।

কুমার নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

চন্দ্রলেখা তখন উজ্জ্বল মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল "চুপ করিয়া রহিলে যে, বল না কেন রত্নমালাকে দেখিতে পারিতে না?"

কুমারের মুখ উজ্জ্বল হইল। আদর করিয়া চন্দ্রলেখার মুখচুম্বন করিলেন। মনে হইল "যে গুণে চন্দ্রলেখা রত্নমালাকে আজ ভালবাসার অংশ দিতে প্রস্তুত, সেই গুণে

বালিকা বয়সে একদিন সুশীলাকে তাঁহার কোলে বসাইয়া পলাইয়া গিয়াছিল।" এখন সেই কথা মনে পড়িল, পাঠক! তাই কুমার চন্দ্রলেখার মুখচুম্বন করিলেন।

তত মিষ্ট চুম্বন তাহার আজ ভাল লাগিল না। চন্দ্রমুখ অপসারিত করিয়া কহিল, "যাও আর তোমার সোহাগে কাজ নাই।"

অধোবদনে মনে মনে কহিল "রত্নমালা! তোমার ভালবাসাই যথার্থ, তাই ভালবাসার পাত্রকে রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছ। তোমার আশীর্ব্বাদ যেন সত্য হয়, আমিও যেন তোমার মত মরিতে পাই।"

চন্দ্রলেখার দুনয়নে চারি ধারা প্রবাহিত হইল। অঞ্চলে বদন মুছিয়া রত্নমালা প্রদত্ত কণ্ঠহারটী উন্মোচন করিয়া ধীরে ধীরে কুমারের কণ্ঠে অর্পণ করিল।

কুমার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি চন্দ্রলেখা!"

চন্দ্রলেখা কোন উত্তর না দিয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহার সেই কণ্ঠলগ্ন রত্নমালার রত্নপ্রদীপ্ত দেবদুর্লভ বদনের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ

PRINTED BY BARODA KUNTA CHUKRAVARTY, BIMOL PRESS, NO. 9. BALARAMDAY'S STREET, AND PUBLISHED BY SHOME PROKAS DEPOSITORY, 54 CORNWALIS STREET, CALCUTTA.